তারতম্য অনুসারে নানা দিক দিয়া দেখিলে গল্পগুলিকে নানা শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু এতগুলি শ্রেণী-বিভাগ করিয়া এত রকমে তাহাদের রূপ ও রসের বিশ্লেষণ করা ক্ষুদ্র শক্তি স্বল্পকাল ও অল্প স্থানের পক্ষে সম্ভব নহে। এখানে আমরা কেবল বিস্ময় রসের কথাই দুই একটা আলোচনা করিব।

জীবনে মানুষ আপনাকে ধন জন যৌবন হিংসা প্রেম মান মর্য্যাদা নানা জালে জড়ায়। এই পার্থিব জটিলজালই তাহার কাছে শাশ্বত হইয়া উঠে। অথচ সে জানে যে, একদিন এই জাল ছিন্ন করিয়া সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া অথবা পিছনে ফেলিয়া তাহাকে অকস্মাৎ বিদায় লইতে হইবে। ইহা হইতে মানুষের মনে একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। সমস্ত জীবন দিয়া মানুষ তিল তিল করিয়া যাহা গড়িল, যাহা বেষ্টন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াই প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বাঁচিল, তাহার ভিতর হইতে সে কোথায় যায়? যদি যায় তবে কি অতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার সৃষ্ট এই সংসারের চারিধারেই ঘুরিয়া বেড়ায় না, ইহাকেই ফিরিয়া পাইতে চায় না! অজানা লোকে কেমন করিয়া সে শান্তি পায়? অথবা শেষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়!

জীবিত মানুষের অনন্তকাল এই দেহে কি পর দেহে বাঁচিয়া থাকিবার যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহারই সহিত আপনার ও পরের মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহল ও বিস্ময় মিলিয়া যে ভৌতিক বিস্ময় রসের সৃষ্টি হইয়াছে, মানুষ চিরকাল নানা কাহিনীর ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে তাহা ছিল নিছক ভূতের গল্প। তাহার ভিতর বর্ণভঙ্গিমার কি রেখা-বিন্যাসের কোনো বালাই ছিল না; মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাস ভয় বিস্ময় সংস্কার প্রভৃতির কোনো বিশ্লেষণ ছিল না; কেবল ছিল বিভীষিকাময় ও বিস্ময়কর রহস্য-লোকের ছবি। কিন্তু মানুষের ভাষার ক্ষমতা, চিন্তা শক্তি, আপনার অনুভূতিগুলিকেও বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সাহিত্য-বস্তুর ছাঁচটির কারিগরি ও মাপ জোখ নানা নিয়ম মানিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতের গল্পের চেহারা বহুল পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে মানুষ নিছক ভয় ও বিস্ময়ের ঘটনামালা করিয়া রাখে নাই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনার কৌতূহল, সংশয়, বেদনা, অতৃপ্তি, ক্ষোভ, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা সকল কিছুতেই প্রকাশ করিতেছে, আপনার বিচার, বুদ্ধিকে ও অধ্যাত্ম বুদ্ধিকেও টানিয়া আনিয়াছে। আবার সকল গুলিকে মিলাইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির একটি সমগ্র রূপও প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে হয় ত বিশেষ একটি রস কি অনুভূতি আর সবগুলিকে ছাপাইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এতখানি উঠিতে পাইতেছে না যাহাতে ইহার বিশেষ ছন্দটির পতন হয়, কি তাল কাটিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত না মৃত' 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'গুপ্তধন', 'ক্ষুদিত পাষাণ', 'মাষ্টারমশায়' প্রভৃতি গল্পে এই বিস্ময় রসকে নানাভাবে পাই। আবার 'মহামায়া' 'মধ্যবর্ত্তিনী' প্রভৃতি গল্পে যদিও ঠিক এই রসটি নাই, তবু ইহা যেন গল্পের মূল বস্তুটকে ছুঁইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনো গল্পেই ভৌতিক বিস্ময় রস অন্যান্য রসকে ও লেখকের সংশয় ও বিশ্বাসকে ছাপাইয়া চাপা দিয়া যাইতে পারে নাই। সে আপনার মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিয়াছে।

'মণিহারা' গল্পটি সাধারণ ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য বাড়িটি 'পোড়ো' এবং 'অভিশাপগ্রস্ত' বলিলে স্বভাবতই মানুষের মনে একটু রহস্যময় কৌতূহল জাগাইয়া তোলা হয়। কিন্তু তারপরই গল্পটি একেবারে আমাদের পরিচিত সংসারে নামিয়া আসিয়াছে, নায়কটি নব্যবঙ্গ, নায়িকা অলঙ্কার-বিলাসিনী সুন্দরী সুগৃহিণী; সুতরাং ইহার ভিতর রহস্য লোকাতীত হইয়া উঠিবার কোনো ঠাঁই নাই। মণিমালিকা ঢাকাই শাড়ী ও বাজুবন্ধ পরে এবং রন্ধনে নুন ঠিক দেয়; অতএব তাহাকে লইয়া যে গল্প রচিত হইবে সে তাহার স্বামীর মনোরাজ্যের ও গৃহ-কোণের সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিসের হইতে পারে? সেই ছন্দেই গল্প চলিতেছিল। হঠাৎ ছন্দ বদ্‌লাইয়া গেল। গহনা লুকাইবার তাড়ায় মণি বাপের বাড়ী পালাইলে শূন্য গৃহে নায়ক ফণি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন হঠাৎ সেই 'পোড়ো' অভিশাপগ্রস্ত বাড়ীটার ছবি অল্পে অল্পে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইবার বুঝি কি ঘটে! গভীর রাত্রি, নির্জ্জন গৃহে 'জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকারের'

সামনে শ্রাবণ বর্ষণের মাঝে একাকী জাগিয়া ফণি বসিয়া আছে; রহস্য এইখানেই গভীর হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই কঙ্কাল ও অলঙ্কারের ঠক্‌ঠক্ ঝমঝম্ নদীর ঘাট হইতে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত রাতের পর রাত কঙ্কালময়ী সালঙ্কারা মণিমালিকার আসা যাওয়া, পড়িতে পড়িতে গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে। ফণি জাগিয়া উঠিয়া দেখে কেহ কোথাও নাই। এইখানে যেই রহস্য গভীরতর হইয়া উঠিল, ভৌতিক বিস্ময় উগ্র হইয়া উঠিল, অমনি লেখনীর মুখে সংশয়ের সুর ধ্বনিয়া উঠিল। সত্য যাহা ছিল তাহা স্বপ্ন হইল; আবার স্বপ্নই সত্য, কি জাগরণ সত্য সে লইয়াও দ্বন্দ্ব লাগাইয়া গেল। কিন্তু তাহাতেই শেষ হইল না। সেই রাত্রের স্বপ্ন-জাগরণ মিশ্রিত নাট্যের অভিনয় আবার চলিল।

এবার কঙ্কালের পিছু পিছু ঘাটে আসিয়া ফণি জলে নামিল। তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, কিন্তু নিশি-তে ডাকার যে চিরপ্রচলিত গল্প আছে, সেই গল্পেরই মত তাহার পরক্ষণেই সলিল সমাধি হইল। কঙ্কালময়ী মণিমালিকার এ ডাককে যখন গভীরতম রহস্য বিস্ময় ও ভীতির সোপানে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, তখনও তাহাকে পাছে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া যায়, তাই লেখক ফণির শেষ মুহূর্ত্তে বলিলেন, ফণিভূষণের তন্দ্রা টুটিয়া গেল…স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্ত্ত মাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।' পাছে রসভঙ্গ হয় তাই আগেও একথা বলেন নাই, শেষেও বেশী জোর দেন নাই। কিন্তু এই স্বপ্নলীলাকে এতখানি ভয়ঙ্কর করিতে তাঁহার প্রাণে লাগিল, কাজেই তার ভয়ঙ্কর রূপটা দেখাইবার পুরাপুরি আনন্দ পাইবার পর হঠাৎ সদয় হইয়া তিনি সমস্তটাকে একটা পরিহাসের ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। এতক্ষণ যে গল্প শুনিতেছিল সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল 'আমার নাম ফণিভূষণ এবং আমার স্ত্রীর নাম ছিল নৃত্যকালী।' গল্পের কাঠামোর ভিতর কোথাও ঘা লাগিল না, কারণ তাহা যতখানি মনস্তত্ত্ব চর্চ্চা করিবার লোভ প্রেম ইত্যাদির রূপ দেখাইবার এবং ভয় ও বিস্ময় জাগাইয়া ভয়ঙ্কর পরিণতিতে আনিবার তাহা আনিয়াছে। লেখকের গল্পের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরই পাঠকের বুকের বোঝাটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য সহাস্যে তিনি বলিলেন, "ওটা আগাগোড়া পরিহাস" এ যেন প্রাণ ভরিয়া গালাগালি করার পর তাহা প্রত্যাহার করা। মনের ঝাল মিটাইয়া গালি দেওয়া হইল, আবার মানহানির মোকদ্দমা এবং মিথ্যা ভাষণের পাপও বাঁচিয়া গেল।

এমনি করিয়া সকলগুলি বিস্ময় রসের গল্প বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায় সর্ব্বত্রই নানা রসের মাত্রা কেমন ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, যে রসে যাহার বিশেষত্ব তাহাতে সে অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া যায় নাই। তাহার একটা মনগড়া মীমাংসাও করিয়া লইতে হয় নাই। তাহাও গল্পের ভিতর হইতেই হইয়া গিয়াছে।

একমাত্র 'ক্ষুধিত পাষাণে' আমরা দেখি, বিস্ময়রসকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। চরম বিস্ময়ের কোঠায় পাঠককে তুলিয়া দিয়া তিনি অকস্মাৎ ট্রেণে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। কেবল মনটা বোধ হয় একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল তাই যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন, "লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানান।"

ক্ষুধিত পাষাণের এই নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়রসের বিষয়েও বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু স্থানও নাই সময়ও নাই, তাই থামিতে হইল।

শেষকালে কেবলমাত্র একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বিচিত্র দিক সম্বন্ধেও কিছুই বলা হয় নাই, সকল গল্পের ভিতরই যে বিশেষ একটি বিশেষত্ব আছে সে বিষয়েও কিছু বলা হয় নাই। তাঁহার ছোট গল্প মাত্রের ভিতরই একটি সুষমা ও সামঞ্জস্যের চিহ্ন আছে, তাহা কোথাও অতি বাস্তব হইবার আগ্রহে আর্টের বাঁধন ছিঁড়িয়া খবরের কাগজের পুলিশ আদালতের রিপোর্ট কিম্বা মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকের রেকর্ড বই হইয়া দাঁড়ায় নাই। পঙ্কেও যেখানে তাহার জন্ম সেখানে সে পঙ্কজ হইয়া উপরের দিকে চাহিয়াছে, কারণ আর্ট মাটি নয়, মাটি হইতে গড়া স্রষ্টার হাতের প্রতিমা, আর্ট কালি নহে, তুলির লিখনে আঁকা ছবি। সৌন্দর্য্য, সংযম, সুবিন্যাস ও সুসঙ্গতিই যে তাহার জীবন তাহা রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণ ভুলিলেও তিনি কখনও ভোলেন নাই।

—শান্তি নিকেতন

রবী: নাথ ও মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নিজে যে-সব মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই এখন আমার সম্মুখে নাই। তাহার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু লিখিবার সময়ও নাই। এই জন্য কোন কোনটির সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইতেছে তাহাই লিখিব।

রবীন্দ্রনাথের মাসিক পত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা "জ্ঞান প্রকাশ" নামক মাসিকে বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা "জ্ঞানপ্রকাশে" করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

আমার লেখাটা রবীন্দ্রনাথকে সার্টিফিকেট দেওয়ার মত হইয়াছে। লেখাটার অন্য কোন গুণ না থাকিলেও উহার এই হাস্যকরতা উপভোগ্য হইবে।

তাঁহার "বালক" দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যে উহা তিনি যে-সব বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক-কালের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মাপকাঠি অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কারণে উহা 'ভারতীর" সহিত মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি "ভারতী", "ভাণ্ডার", "সাধনা" এবং "বঙ্গদর্শন"এরও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। সুতরাং উহা কিরূপ কাগজ ছিল, সে বিষয়ে অপর অনেকের মত আমার জানা থাকিলেও, আমার নিজের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত কোন কোন বহি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ঠিক কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে-সকল বাংলা মাসিক পত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজখানির উপরই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও লিখন-ভঙ্গীর ছাপ অনুভূত হইত—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইত। ইহার একটা কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজখানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে শুনিয়াছি—এবং আশা-করি তাহা ঠিক শুনিয়াছি ও ঠিক মনে আছে। তিনি অন্য লেখকদের লেখা খুব সুধরাইয়া দিতেন; তাহাতে হয় ত অনেক লেখা প্রায় পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সংস্কৃত হইয়া তবে "সাধনা"য় বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর একটা তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া "মানুষ" করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবিবাবু তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞতা-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজগুলির সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথ নির্দেশ ত কার্য্যতঃ করিয়াইছেন, অন্য কাগজের সংস্রবেও বহু লেখকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল "প্রবাসী"র "সংকলন" বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে

ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ খুবই হইত; অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সংকলন কার্য্যের জন্য পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই যে, কোনো কাজকেই ড্রাজারী (Drudgery) বা গাধার খাটুনী বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

আমার এই লেখাটা "গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ" 'উল্লেখ-যোগ্য' "মৌলিক প্রবন্ধ" নহে, সুতরাং দু একটা বাজে কথাও এখানে বলা চলিতে পারে। সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইবার জন্য আমি কিছু কিছু বিলাতী কাগজ কিনিতাম বটে, কিন্তু অনেক কাগজ পাইতাম আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রয়াগনিবাসী বামনদাস বসু মহাশয়ের নিকট হইতে। পুরাতন খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র কিনিয়া তাহা হইতে সারসংগ্রহ করা তাঁহার একটি বাতিক ছিল। তিনি পাঠানদের দেশে থাকিতে একবার দশমণ পুরাতন খবরের কাগজ কিনিয়া তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ কাটিয়া খাতা বোঝাই করেন। এই কর্ত্তিত প্রবন্ধগুলির ওজন হইয়াছিল আড়াই মণ। বদলী হইবার সময় তিনি এই আড়াই মণ জিনিষও ভাড়া দিয়া আনিয়াছিলেন, এবং তৎসমুদয় তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ রচনার কাজে লাগিয়াছে। এলাহাবাদের চৌকের নিকটবর্ত্তী গুধড়ী বাজারে সকল রকম পুরাতন জিনিষ পাওয়া যায়। সেখান হইতে বসু মহাশয় বিস্তর পুরাতন বহি ও ইংরেজী মাসিক কাগজ কিনিতেন। মাসিক কাগজগুলি বাক্সবন্দী হইয়া "প্রবাসী"র জন্য আসিত। কিছু-কাল পরে রবীন্দ্রনাথ সংকলন বিভাগের ভার ত্যাগ করেন। তাহার একটা কারণ, ইংরেজী ম্যাগাজিনগুলির ক্রমাধোগতি, তাহাতে আর আগেকার মত হিতকর ও মনোহারী লেখা থাকিত না।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মাসিক পত্র সম্পাদককে অন্যের রচনার প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিম্বা তাঁহাদিগকে যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্ত্তি করিয়া বাহির করিতে হয়। সম্পাদকের নিজেরই যদি নানা রকম প্রবন্ধ গল্প কবিতা সমালোচনা প্রভৃতি লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা অল্প সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি যত সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনি যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিতে পারেন, অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। এই জন্য, অন্যের সাহায্য না পাইলে ও নিয়মিতরূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিচিত্র রচনাপূর্ণ মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। এরূপ সঙ্কল্প তিনি কখনও করিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু করিলে তাহা ব্যর্থ বা বিন্দুমাত্রও অশোভন হইত না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি সম্বন্ধে বলিবারও অনেক কথাই আছে। এখন হাল্কা রকমের দু একটা কথা বলি। যখন "সাধনায়" 'ক্ষুধিত-পাষাণ" গল্পটি পড়িয়া-ছিলাম, তখন সেই মায়াপুরীর সম্বন্ধে ও তাহার অধিবাসিনী সুন্দরীর সম্বন্ধে কি যে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কবি যাহার মুখ দিয়া গল্পটী বলাইতে-ছিলেন, সেই লোকটি কৌতূহলকে চরম সীমায় উপনীত করিয়া হঠাৎ একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়ায় অনতি-ক্রান্তযৌবন পাঠকের মন কবির প্রতি প্রসন্ন হয় নাই! গল্পটি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম অনেক রাত্রে। সে রাত্রে ঘুম হইয়া থাকিলে কখন হইয়াছিল মনে নাই। 'বিনি পয়সার ভোজ' যখন রবীন্দ্রনাথের কাগজে পড়ি, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। তখন আমরা কয়েক পরিবার বেনিয়া-টোলার লেনের একটি বাড়ীতে থাকিতাম। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা অতিমাত্রায় হাস্য-রসোন্মত্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কর্ত্রীদিগের দ্বারা ভৎসিত হইয়াছিলাম মনে পড়ে।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনা সভা স্থাপন করেন। তাহার নাম তুলিয়া

গিয়াছি। তখন উঁহার আফিস ছিল ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে। ঐ আফিসে বহু সাহিত্যিকের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রয়োজন এখনও আছে।

নিজের মাসিক পত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া তিনি অন্ত যত মাসিকে লেখা দিয়াছেন, তাহার সব-গুলির নামও আমি জানি না। এবিষয়ে তিনি খুব মুক্তহস্ত। মাসিক পত্রের লেখকরূপে তাঁহার একটি গুণের সাক্ষ্য ভুক্তভোগী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম-নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ বহু ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাহার কোন কিস্তির জন্ত কখন অপেক্ষা করিতে বা তাগিদ দিতে হয় নাই। বরাবর মাসের ১লা কিম্বা ২রা তাঁহার লেখা ডাকে আসিয়া পৌছিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয়ও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উঁহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ধৈর্য্য, সংযম ও নিয়ম-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল। কবিরা বড় এলোমেলো ও খাম-খেয়ালী বলিয়া তাঁহাদের একটা বদ্‌নাম আছে। কিন্তু রবিবাবু কবি কিনা সে বিষয়ে কোন কোন বাঙালী ও অবাঙালী গভীর্ গবেষকের সন্দেহ থাকিলেও, মাসিক পত্রের খোরাক জোগান সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিন্দা করা চলিবে না। এ বিষয়ে তাঁহার সময়নিষ্ঠা অনতিক্রান্ত। ইহা তাঁহার অকবিত্বের প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আমাকে এই সাক্ষ্য দিতে হইল।

এইরূপ নিয়মনিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন-না-কোন মাসিকের সম্পাদক থাকিতেন বা থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত! তাহার আর একটি কারণ এই, যে, তিনি সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিলেও তাহাতেও সাহিত্য-রস থাকে। যাহা হউক, সুখের বিষয় সম্পাদকের কাজ তিনি কখন কখন করিয়া অন্যের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন কিন্তু উহাতে অনর্থক বরাবর নিজের শক্তি ক্ষয় করেন নাই। কারণ সম্পাদকের কাজ প্রতিভাশালী মনীষীদের কাজ নহে; শ্রমপটু সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দ্বারাই উহা চলিতে পারে। ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩।

—শান্তিনিকেতন

রূপছায়া

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২

পিকচার-প্যালেস, না, অপ্সর লোক! শ্রী ও সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন! রূপের উৎস ছুটিয়াছে, হাসির অজস্র লহর চারিদিকে! সজ্জিত বেশভূষা। এদের পানে চাহিলে মনে হয়, এরা কোন্ কল্পলোকের অধিবাসী—হাসি আর আনন্দ লইয়াই শুধু আছে! মনে কাহারো কোনদিন কোনো বেদনার আঘাত লাগে নাই,—তরল কৌতুকে জীবনটাকে ঢালিয়া পরম সুখে বাস করিতেছে! এদের মধ্যে নিজের এই বাসনা-খিন্ন মনটাকে লইয়া বসিতে তার এমন বাধিতেছিল! কি অশুচিতার কালিই না তার অন্তর চিরিয়া সারা অবয়বে লাগিয়া রহিয়াছে!

বায়োস্কোপের পর্দ্দা উঠিলে কয়েকটা সাজ-পোষাকের ও রং-তামাসার ক্ষুদ্র ছবির পর যে-ছবি জাগিল, সে-ও কোন্ দুনিয়া-ছাড়া স্বপ্ন-লোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিল! রূপের সেখানে উৎসব চলিয়াছে! তরুণীর দলে মন লইয়া কি ও খেলা! ছবি ছিল, এক সমুদ্রের নীল জলে তরুণীর দল সাঁতার কাটিতেছে—জলের বুকে যেন কমলের মালা ভাসিতেছে! কি স্বচ্ছন্দ তাদের জলখেলার ভঙ্গী! রাজ্যের রূপ ঐ সব পরিপুষ্ট-যৌবনারা সর্ব্ব অবয়বে লুটিয়া আনিয়াছে! বিশেষ ঐটি···তার কৌতুক, তার হাসি ··যেন কোন্ মায়া-লোকের!

তারপর এক মোটর-বোটে চড়িয়া সেখানে আসিল এক তরুণ যুবা। তাকে দেখিবামাত্র তরুণীদের চঞ্চলতার মাত্রা আরো বাড়িয়া উঠিল···বিশেষ সেই নায়িকাটির। তরুণীরা গিয়া বোটে চড়িয়া তরুণকে সবলে জলে ফেলিয়া দিল। তাদের সঙ্গে খেলায় মাতিয়া নায়িকার পানে চাহিবার তরুণের অবসরও মিলিল না! এই খেলা-রঙ্গের মাঝ দিয়া ক্রমে জীবনের সুগভীর মুহূর্ত্তে সকলে আসিয়া পড়িল!··· তরুণীর অভিমান প্রচণ্ড হইয়া তার উন্মত্ত হৃদয়কে তরুণের সহস্র আবেদন হইতে এমনি পৃথক করিয়া রাখিল যে, কোথায় গেল তরুণের সে চপল খেলা-হাসির উচ্ছ্বাস! বেচারীর শত সাধনা ব্যর্থ নিষ্ফল করিয়া তরুণী তেমনি বিমুখতায় নিজের মনকেও বাঁধিয়া ফেলিল! ইহার পর ইন্‌টারভ্যাল।

দপ্ করিয়া বিজ্‌লী-বাতিগুলা জ্বলিয়া উঠিল। সামনের সীটে দর্শকের দলে নানা চীৎকার-কলরব উঠিতে ব্রজনাথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিল, সে কঠিন সহরের বুকে পিক্‌চার-প্যালেসে বসিয়া আছে, পরীর ডানায় ভর করিয়া কোনো মায়ায় রচা স্বপ্ন-লোকে সত্যই উড়িয়া যায় নাই! আর তার চোখের সামনে এই যে নিমেষ-পূর্ব্বে ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে কোন্ অজানা "লোকের" মানব-হৃদয়ের দুঃখ-সুখ চপলার চকিত-চমকের মত জাগিয়া নিবিয়া, নিবিয়া জাগিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, তার প্রাণকে নানা ছন্দে দোলা দিয়া—সেগুলা স্বপ্নলোকেরও নয়, মর্ত্ত্যলোকেরও নয়, সেগুলা অবোলা ছবি, বিভ্রম মাত্র···তখন সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একবার ঐ দর্শকের দলের উপর দুই চোখের দৃষ্টি বুলাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

ঐ যে ছবির জগতে আনন্দের দীপ্ত সুর জাগিয়া উঠিয়াছে, ও সুর সত্য করিয়া প্রাণের মধ্যে পাওয়া কি এমনি কঠিন? ও প্রীতি, ও উচ্ছ্বাস···? তখন তার মনে হইল, তার নিজের জীবনটা কি-ভাবেই না ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! মানুষের জীবনে তরুণী নারীর রূপ কি কুহক না জাগাইয়া তোলে, আবার কি নিষ্ফলতাও আনিয়া দেয়,—কাজ-কর্ম্মের শত

কোলাহল ভেদ করিয়া মন ঐ রূপের সুধা পান করিতে পাইলে কি আনন্দেই না মশ্‌গুল হয়! হায় রে, তার জীবনটা আঁধারেই কাটিয়া গেল! এই যৌবন, যা নেহাৎ ক্ষণিক, যে-যৌবনে শত কল্পনা ময়ূর-পুচ্ছের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মত রঙীন রেখায় ফুটিয়া ওঠে…সে-যৌবন তার প্রাণে কল্পনার একটু রেখাও পাত করিয়া গেল না! জীবনের ঘন আঁধারে ঐ রূপ বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকও একটা ফুটাইয়া তুলিল না! অথচ একদিন…কি স্বপ্নই সে দেখিত।

অদূরে একটা সীটে তার নজর পড়িল। এক তরুণ যুবা কি আদরে, কি সোহাগে তার পাশের সঙ্গিনীটিকে 'আইশ-ক্রীম' খাওয়াইতেছে…ও ধারে ঐ দুটি তরুণ-তরুণীর নিভৃত গুঞ্জন! কি কথা কহিতেছে?…প্রাণের যত সাধ, যত আশার রাগিণী…! দুনিয়ার আশে-পাশে আরো যে বহু প্রাণী পড়িয়া আছে, সেদিকে কোনো লক্ষ্যও নাই…!

প্রচণ্ড বেদনায় ব্রজনাথের সারা অন্তর হা-হা করিয়া উঠিল। ওরে প্রেমস্বর্গচ্যুত, দুর্ভাগা, এখানে কি লইয়া এদের মাঝখানে তুই আসিয়া বসিয়াছিস্! ওরে অভিশপ্ত, সরিয়া যা, তোর নিশ্বাসে এদের এ হাসি-খেল, এ রূপের উৎসব শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবে!…

ওদিকে আবার আলো নিবিল,…ছবি সুরু হইল। তরুণের বেদনার ধারা…প্রচুর ধৈর্য্য লইয়া অধীর প্রতীক্ষা… নায়িকার মনটাও ক্ষণে ক্ষণে উদাস হইয়া আসে, তার খেলা সহসা থামিয়া যায়, ভিড়-জটলা ছাড়িয়া বিদ্যুতের মত কোথায় নিভৃত অন্তরালে সে সরিয়া পড়ে! হাসি-খুশীর মাঝে অকস্মাৎ তার দুই চোখ ছলছলিয়া ওঠে, রূপের জ্যোৎস্নার উপর ম্লানিমার মেঘ পাৎলা কালো পর্দ্দার আড়াল রচিয়া তোলে…সে কি করুণ, কি মধুর! নায়িকার মনের মধ্যে ঐ যে নীরব দ্বন্দ্ব, ও টুকুও প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার মত…!

শেষে নায়িকা আর তার ঐ মৌন অভিমানে-রচা কঠিন দুর্গে বসিয়া থাকিতে পারিল না; তরুণ কোন্ পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছাতুর দেহে গৃহের কোণে পড়িয়া ছিল, নায়িকা পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িল, দুই চোখে অশ্রুর ঝরণা—ওগো প্রিয়, ওগো বন্ধু, মার্জ্জনা, মার্জ্জনা কর! আমার বিমুখতার তীক্ষ্ণ শর তোমার অন্তরটাকে বিঁধিয়া বিঁধিয়া জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে—জানি, তা জানি! নিজের মন দিয়াই জানি, কি আঘাত তোমায় দিয়াছি এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া! কিন্তু এ মনও তার কি বেদনা সহ্য করিয়াছে, অহরহ…তা যদি বুঝিতে!

ব্রজনাথের মন ভরিয়া উঠিল। নায়িকার ঐ অশ্রুর রাশিতে কি সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পরশ!

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিতে ব্রজনাথ চাহিয়া দেখে, লোকগুলা উঠিয়া বাড়ী চলিয়াছে। কখন্ যে ছবি বন্ধ হইয়াছে, সেদিকে তার হুঁশও ছিল না। স্বপ্নাভিভূতের মত ব্রজনাথ উঠিয়া বাহিরে আসিল।

সোজা আসিয়া সে কার্জ্জন পার্কে ঢুকিল। একধারে একটা বেঞ্চ খালি পড়িয়াছিল, ব্রজনাথ বেঞ্চটায় বসিয়া পড়িয়া একটু-আগে-দেখা ছবির কথাই ভাবিতেছিল! ঐ তো নায়িকা—ও'ও নারী, রূপে-সুষমায় চারিদিক আলো করিয়া তুলিয়াছে! তবু তো সেই তরুণের পানে দরদে একেবারে ফাটিয়া লুটাইয়া পড়িল—কতখানি তার প্রীতি আর ভালোবাসা! সার্থক ঐ তরুণের জীবন! তার কিসের অভাব? অমন রূপসী তরুণীর এত দরদ পাইলে ব্রজনাথ যে দুনিয়ায় আর কোনো-কিছুর পানেও চাহিয়া দেখে না!

তার ভাগ্য!…ব্রজনাথ শিহরিয়া উঠিল। মুখরা স্ত্রী, রূপের ছায়াও তার অবয়বে নাই! অথচ এই স্ত্রীকে ব্রজনাথ চিরদিন সহ্য করিয়া আসিয়াছে! তার পরুষ বচন, তার সহস্র অভিযোগ—এ-সবের বিরুদ্ধে নিমেষের জন্যও ব্রজনাথ কোনো দিন চোখ রাঙাইয়া চাহে নাই! সে যা বলিয়াছে, ব্রজনাথ তাই মাথা পাতিয়া লইয়াছে। তার রূঢ়তা, তার বিমুখতা… এত আঘাতেও ম্লান হাসি ঠোঁটে লইয়া সে নীরজার সামনে দাঁড়াইয়াছে!

তবু নীরজা চলিয়া গেল…তুচ্ছ ব্যাপারে কতখানি রোষের বহ্নি জ্বালিয়া দিয়া! ব্রজনাথের মনটাকে দুই পায়ে নির্ম্মমভাবে মাড়াইয়া চলিয়া গেল!

ব্রজনাথ আকাশের পানে চাহিল, একরাশ নক্ষত্র স্তম্ভিত নেত্রে তারি পানে চাহিয়া আছে! তার বুক দুলিয়া উঠিল। তার মন এখানে বেদনায় সারা হইয়া

যাইতেছে, সেই মুখরা হৃদয়-হীনা স্ত্রীর প্রসাদটুকু ফিরিয়া পাইবার জন্ম আজো এখনো কি অধীর আকুল সে।…কিন্তু নীরজা কি সেখানে ব্রজনাথের কথা একটুও ভাবিতেছে! .. তার মিনতি-ভরা অশ্রুর স্মৃতি…! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে ফুলিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—না!

দূরে গাড়ী ছুটিয়াছে! ওই-কর্ম্ম-শ্রান্ত লোকজন, কি আশা বুকে লইয়াই চলিয়াছে সব…গৃহ-কোণটুকু লক্ষ্য করিয়া! সেখানে কি আরাম, কি স্নেহ-প্রীতিই না তাদের জন্য পুঞ্জিত আছে!…ব্রজনাথ উঠিয়া পড়িল। এত-বড় ছনিয়ায় একটু জুড়াইতে পারে, এমন একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ তারি শুধু নাই! একটু দরদ-ভরা দৃষ্টিতে প্রাণের পানে চাহিবে এমন-জনও তার কোথাও নাই। এই বিপুল বিশ্বে সে একা, নেহাৎ একা! মন তখনি সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল, কাপুরুষ! সে কি কিছু পারে না? দরদ-প্রীতি সবলে লুণ্ঠন করিতে না পারুক, এই বিমুখতা, এই দর্প,…সেগুলাকে প্রচণ্ড আঘাতে খর্ব্ব করিতে পারে, এটুকু শক্তিরও তার এমনি অভাব!

পার্কে নামিয়াই গাড়ী সে বিদায় করিয়া দিয়াছিল; উঠিয়া এস্প্লানেডে ট্রামের আস্তানায় আসিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া ডাকিল,—ব্রজনাথ…

ব্রজনাথ ফিরিয়া দেখে, অবিনাশ। সে কহিল,—অবু যে! এমন সময় কোথা থেকে হে?

অবিনাশ কহিল,—আর বল কেন! বোনটার জন্যে পাত্র দেখতে গেছলুম ভবানীপুরে। ডাগর হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে, অথচ সে তো এতগুলি পয়সার খেলা! কি যে করবো!…কথার শেষে অবিনাশের কণ্ঠ হইতে হতাশা ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজনাথ কহিল,—পছন্দ হলো?

অবিনাশ কহিল,—তা হয়েছে। তবে পছন্দ হলেই তো শুধু চলবে না।…কাঁড়ি যোগাতে হবে।

ব্রজনাথ কহিল,—কত চায়?

অবিনাশ কহিল,—ফর্দ্দ কাল পাঠাবে, বল্লে…তা বাড়ী যাবে তো?

ব্রজনাথ কহিল,—এখুনি ফিরে কি করবো?

অবিনাশ কহিল,—জানি, বিরহী তুমি! কিন্তু একা এই মাঠে এত রাত্রে ··

ব্রজনাথ কহিল,—রাত্রি হয়ে গেছে, তা ঠিক। কি করা যায়, বল দিকিন্? বলিয়া অবিনাশকে একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—খিদেও পেয়েছে। যাবে' হোটেলে? তোমারও তো খাওয়া-দাওয়া হয়নি?

অবিনাশ কহিল,—হোটেলে? চল! বাড়ীতে তো সেই নিত্য-পূজোর নৈবিদ্যি! একটু তবু মুখ বদলানো যাবে, মন্দ কি!

দুইজনে তখন ইম্পারিয়ালের দিকে চলিল।

৩

আহার করিতে বসিয়া জীবনটাকে লইয়া বহু আলোচনা হইল। ব্রজনাথ কহিল,—জীবনটা ভারী একঘেয়ে ঠেকছে; কোনো বৈচিত্র্য নেই—এ কি জীবন! ঘৃণা ধরে গেছে।

অবিনাশ কহিল,—তা তো ধরবেই হে! ভগবান পয়সা দিয়েছেন, মন দিয়েছেন,—এত বড় পৃথিবীতে কত বৈচিত্র্যও রয়েছে—তবে তা নিতে জানা চাই!

—তার মানে?

অবিনাশ কহিল,—চারিদিকে একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখতে হয়।

বায়োস্কোপের সেই রূপ-লীলার দৃশ্য তখনো ব্রজনাথের মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই!…রূপ! রূপ! যৌবনের উদ্যানে রূপের গোলাপ…তার শোভা, তার গন্ধ ··মন যে বিভোর তারি স্বপ্নে! তার মন অমনি রূপের সঙ্গ চাহিতেছে আজ ·· অমনি হাসি-খুশী আনন্দের ডালি! কিন্তু সে যে দুর্লভ, সাধনার সামগ্রী! সজ্জিত বেশে হাসির উচ্ছ্বাসের মতই তরুণী মেম-সাহেবরা পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, হোটেলের প্রকাণ্ড খোলা জানলার মধ্য দিয়া তাদের স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। শুধু দেখা নয়, তাদের হাসির অতি-মৃদু উচ্ছ্বাসটুকু অবধি আসিয়া প্রাণটাকে পরশ দিয়া যাইতেছিল!

ব্রজনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তাই চেয়েই দেখবো এবার—রাজী!

অবিনাশ স্থির দৃষ্টিতে ব্রজনাথের পানে চাহিল। ব্রজনাথ

কাঁটা-চামচ নামাইয়া প্লেটের উপর রাখিয়া কহিল,—বৈচিত্র্য কিছু দেখাতে পারো? আমার বন্ধুর কাজ করবে, তাহলে। আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকবো। সত্যি, প্রাণটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! এই বয়সে অবু, এতখানি হাহাকার নিয়ে একা ঘরের কোণে পড়ে থাকা, এ যে কি দুর্ভাগ্য, তা বলতে পারি না! যৌবনকে এমনি করেই গেরুয়া পরিয়ে ছেড়ে রেখে দেবো?

অবিনাশ কহিল,—কিন্তু গৃহিণী··· ?

ব্রজনাথ তাচ্ছল্য-ভরে কহিল,—Pooh! গৃহিণী মানুষ হলে কি আর এ যাতনা সহ্য করি! আমার সব চেয়ে অপরাধ কি, জানো? তারে ভালোবাসা! কিন্তু কিসের জন্যে? এ ভালোবাসা আমি দুই পায়ে চেপে মাড়িয়ে মারতে চাই! কি না সহ্য করেচি···তোমরা জানো না অবু, হাসি-মুখ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিশেছি, কথা কয়েছি, গল্প করে'ছি, কিন্তু প্রাণ আমার সারাক্ষণ জ্বলে পুড়ে এক্‌শা হয়ে গেছে। আজ আমি জীবনটাকে ফিরিয়ে পাবার জন্য, উপভোগ করবার জন্য আকুল মরিয়া হয়ে উঠেচি। এস্‌পার, না, ওস্‌পার! একবার দেখতে চাই, এ-মনকে যোগ্য খোরাক দিয়ে একে সরস, উপভোগ্য করে তুলতে পারি কি না!—কথাগুলা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অবিনাশ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ব্রজনাথকে লক্ষ্য করিতে-ছিল;···ক্ষণিকের উত্তেজনা, না, এ সত্যই ভোগের আকুলতা!

অবিনাশ সেই শ্রেণীর জীব, অপরকে আনন্দের ডালি দিবার ছলে যারা নিজেদের চারিদিকটাকে বেশ করিয়া গুছাইয়া তোলে! পরকে নন্দনের মাঝে পাঠাইয়া তারি নেশায় মশ্‌গুল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াও নিজে সে নেশায় বিহ্বল আত্মহারা হয় না, আপনাকে সচেতন রাখে! বন্ধু সাজিয়া ধনীর বৈঠকখানায় শুধু যে-সব জীব আস্তানা পাতে, এবং ধনীকে সর্ব্বসুখে সুখী করার ছলে নিজের পাওনা ষোল আনা হিসাব করিয়া পকেটে পুরিয়া লয়! বন্ধুর জন্য অসহ্য দরদ জানাইতে যে সহস্র-জিহ্ব হইয়া ওঠে, অথচ ভিতরে ভিতরে নিজের দিকে লক্ষ্য যার সর্ব্বক্ষণ!

অবিনাশ কহিল,—বুঝেচি। তা একটু গানটান শোনো যদি···

ব্রজনাথ বিরক্ত হইয়া কহিল,—কি তুচ্ছ গান শোনার কথা তুলচো হে! আমার প্রাণের মধ্যে যে-শূন্যতা, তা দুটো গানের সুরে ভরিয়ে তুলবে? তুমি নেহাৎ গর্দ্দভ!

অবিনাশ পেগ্‌ আগাইয়া দিল, ব্রজনাথের ওদিকে কোনো আগ্রহ নাই কোন দিন। পেগ্‌ আগাইয়া দিয়া অবিনাশ কহিল,—একটু মুখে দাও না ··

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ব্রজনাথ কহিল,—মদ খেতে বল্‌চো তুমি?···আমি কি এ আমোদ চাইছি?···

পরক্ষণেই সে হাসিয়া ফেলিল; কহিল,—তুমি আমায় থিয়েটারের নাটকের সেই নায়ক পেলে নাকি! মন খারাপ হয়েছে, অতএব মদ খাও - মনে হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে উঠবে! পাগল! নেশা করে মাতাল হয়ে নাচতে হবে, আর সেই নাচ নেচে জীবনে বৈচিত্র্য আনবো!···মাতাল! হুঁঃ, নিজে খাচ্ছ, খাও। ও লোভ আমায় দেখিয়ো না। আমার ওতে রুচি তো নেইই, বরং ঘৃণা হয়!

অবিনাশ অপ্রতিভভাবে কহিল,—না, না, তা নয়। তবে এম্‌নি বলছিলুম, এ তো শুধু জিভে একটু ঠেকানো! নেশা হয় না তাতে!···মনটা শ্রান্ত রয়েছে, টনিকের কাজ করতো!

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—টনিকের কোনো প্রয়োজন নেই!···

ব্রজনাথ চুপ করিল। অবিনাশ পেগটা নিঃশেষ করিয়া একবার ব্রজনাথের পানে চাহিল, পরে কহিল,—তাই তো··· তা, ঠিক কি চাও, বল দিকি আমায়। বুঝিয়ে দাও···হাজার হোক, বন্ধু তো—দেখি, তোমায় একটু আনন্দও দিতে পারি কি না!

ব্রজনাথ কহিল,—নাও, আর ভাবতে হবে না। খেলা হয়েছে তো? চল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে একটু ঘোরা যাক মাঠের চতুর্দ্দিকে। দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটেচে।

অবিনাশ কহিল,—তা নেহাৎ মন্দ বল নি! খাওয়া-দাওয়ার পর···

দুইজনে উঠিয়া ট্যাক্সি লইল এবং ট্যাক্সিতে করিয়া নিরুদ্দেশ ভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘড়ির পানে নজর পড়িতে ব্রজনাথ দেখে, রাত এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ড্রাইভারকে বলিল—চৌরঙ্গী হয়ে আবার গঙ্গার ধারে চলো।

গাড়ী চৌরঙ্গীতে আসিলে পিক্‌চার হাউসের সামনে ব্রজনাথ দেখে, লোকের কি ভিড়! বায়োস্কোপ ভাঙ্গিয়াছে—প্রমোদ-রত নর-নারীর দল হাস্য-কলরবে চারিদিক উছলিত করিয়া বাহির হইতেছে! তেমনি দুনিয়া-ভোলা, স্বপ্ন-লোকের জীব সব! হাসি আর আনন্দ ছাড়া কিছু আর জানে না!

ব্রজনাথ ভাবিল, কি দিলে সে ওদের ঐ অত হাসি-আনন্দের একটি কণা আয়ত্ত করিতে পারে!

অবিনাশকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া ব্রজনাথ আসিয়া নিজের গৃহে নামিল—নামিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া সোজা দোতলায় উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। আঁধারে ভরা, বেদনায় জীর্ণ,...এ যেন কোন্ পাতালের এক অতল গহ্বর! না আছে এখানে আলো বা বাতাস! নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে!

ভৃত্য আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া বিজলী বাতি জ্বালাইয়া দিলে ব্রজনাথের মনে হইল, ও আলো যেন ঘরের এই দারুণ দীনতার প্রতি অট্টহাসির একটা প্রচণ্ড পাথর ছুড়িয়া মারিল! বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রজনাথ ভৃত্যকে কহিল,—আলো নিবিয়ে চলে যা— আলোর দরকার নেই!

ভৃত্য আলো নিবাইয়া চলিয়া গেলে ব্রজনাথ জানলায় ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। বাহিরে জ্যোৎস্না তখন সুরের তরঙ্গ তুলিয়া আলোর ধারায় বহিয়া চলিয়াছে!

—ক্রমশ

যে যার কাজে

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

মীরা পনর দিনের মধ্যে দুটি ঝি-কে নোংরা বলিয়া বিদায় দিলে পাশের বাড়ীর বুড়ো ঝি যে নূতন ঝিটিকে আনিয়া হাজির করিল, দৃষ্টিমাত্রেই মীরা তাহাকে মনে মনে অপছন্দ করিল। বাইশ তেইশ বছরের যুবতী; তার সাদাসিদা সজ্জার মধ্যে লক্ষ্য করিবার কিছুই নাই, তবু তাকে গৃহস্থের গৃহের উপযোগী বলিয়া মীরার মনে হইল না। —গায়ের রং কালো; কিন্তু মুখখানি অতি সুকুমার, কালোর উপরেই সর্ব্বাঙ্গের শ্রীটা বেশ; নাকে একটা ফুল, হাতে চারগাছা করিয়া রেশমী চুড়ী।

নূতন ঝি তার নাম বলিল, বিধু। কিন্তু বিধু যে তার নাম হইতেই পারে না ইহা যেন মীরা তার স্ত্রী-সুলভ সহজ জ্ঞানেই অনুভব করিল। এই মাত্র পাটভাঙ্গা চওড়া পাড় সাড়ীর ভিতর হইতে পুষ্পসারের যে মৃদু সৌরভটুকু বাহিরে আসিতেছিল তাহা যেন নিতান্ত অভ্যস্ত পুরাতন সৌখীনতারই সাক্ষী। কিন্তু উপযুক্ত সাবধানতার সহিত এতকথা বুঝাইয়া বলিবার সাধ্য বা সাহস এই নূতন বধুটির ছিল না। বুড়ো ঝি-কে তৃতীয় বার ফরমাস করিতেই সে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল; বলিয়াছিল, কি যে বল বৌ-মা, নোংরা! বিবি এখন কোথায় পাই বল তোমার জন্যে!

বুড়ো ঝি-র এই অত্যুক্তিটার প্রতিবাদ সে করে নাই, বিবি রাখিবার মত উচ্চ আশাও তার ছিল না; কিন্তু নোংরামি যে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠে।

ঝি একটা চাই-ই। কাজেই দোমনা ভাবে বিধুর মুখের দিকে চাহিয়া মীরা বুড়ো ঝি-কে বলিল, তুমি এখন যাও, আমি বিধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছি।

তার সামনে মীরার কেবল বাধ বাধ লাগে।

বুড়ো ঝি নিজের কাজে গেল।

এবং পাকা করিয়া বাহালের পূর্ব্বে উপক্রমণিকাস্বরূপ মীরা ও বিধুর প্রশ্নোত্তর শুরু হইয়া গেল।

মীরা প্রশ্ন করিল, এর আগে কোথাও কাজ করেছিলে?

বিধু নতমুখ তুলিয়া বলিল, ছিলুম, বৌ-ঠাকুরুণ, এক বড়লোকের বাড়ীতে—ঐ দর্জ্জিপাড়ায়।

—ছাড়লে কেন? না ছাড়িয়ে দিলে?

—ছাড়লুম, বৌ-ঠাকুরুণ, বড় দুঃখেই। বলিয়া বিধু বড় বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। যে অতিকায় দুঃখে বিধু কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে সেটা যে কি তাহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না হইলেও বিধুর বয়সের সঙ্গে তার কোথাও সংশ্রব আছে অনুমান করিয়া মীরা আপন মনেই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

বিধু বলিতে লাগিল, তাদেরও নুন খেয়েছি বৌ-ঠাকুরুণ, কিন্তু গুণ গাইতে যেন জিব সরছে না; মুখখানা গিন্নির বড়ই ধারালো, কথায় কথায় ঝি চাকরকে—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই বিধু চোখের কোণে আঁচল তুলিয়া লইল।

মীরা বিধুর দরদ বুঝিল। দুটি অন্নের জন্য যারা গতর খাটাইতে আসিয়াছে হোক্ না তাদের কাজে ভুলচুক—তাদের অমন করিয়া বাক্যযন্ত্রণা দেওয়া ভালমানুষের কাজ নয়। তারাও ত মানুষ—হইলই বা ঝি চাকর।

—বড় বকত বুঝি?

—কথায় কথায়, বৌ-ঠাকুরুণ, কারণ অকারণ। আসবার সময় যখন দণ্ডবৎ করলুম তখন কি বললে জান, বৌ-ঠাকুরুণ? ছি ছি! বুড়ো মানুষের মুখে এমন কথা! সে কথা ভাবতেও ঘেন্নায় মরে যাই।

বলিতে বলিতে বিধুর এমনই ক্লিষ্ট চেহারা হইল যেন সে মৃত্যুযন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে।

মীরা বলিল, কি বললে?

—আমার পায়ের পানে হাঁ করে খানিক চেয়ে থেকে

বল্লে, তোর ভাতের ভাবনা কি!—বলিয়া বিধু ফিক করিয়া একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

মীরা বিস্মিত হইল।—বিধুর মৃত্যুতুল্য ঘৃণার সঙ্গে তার এই হাসিটুকু যেন ঠিক খাপ খাইল না।

মীরা বলিল, মাইনে কত চাও?

বিধু যেন আকাশ হইতে পড়িল।—মাইনে? মাইনে যা' হয় দিও। আমি চাই, বৌ-ঠাকরুণ, গেরস্ত বাড়ীতে গেরস্তর মত থাক্‌তে। আমি গেরস্তেরই মেয়ে, আজ কপালের দোষে গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি। বাপ্‌ মায়ের বড় আদরের মেয়ে ছিলাম, দিনেকের তরেও কড়া কথাটি শুনি নি, বৌ-ঠাকরুণ; কেউ আমায় কড়া কথা বলতে পায় নি। তাই কেউ গলা চড়িয়ে কথা বল্‌লেই আমি চোখের জল রাখ্‌তে পারি নে। মাইনের কথা বল নি বৌ-ঠাকরুণ, আমি যে তোমার মত মনিবের কাছে আশ্রয় পেলুম এই আমার বাপ-মা'র ভাগ্যি। আমি সৎকায়েতের মেয়ে, তোমার কাছে ভালই থাকব। বলিয়া, সে দুর্ব্বার ভাবাবেগে মীরার পদধূলিই লইতে গেল।

মীরা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল; বলিল, হাজার হলেও তুমি আমার বয়সে বড়; পায়ে হাত কেন দেবে?

বিধু গদগদ স্বরে বলিল, ভাল মুখে কেউ কথা কইলে আমি সাম্‌লাতে পারি নে, বৌ-ঠাকরুণ; অম্‌নি চোখে জল আসে। বুড়ো ঝি বল্‌ছিল, তোমার আগের ঝি ছুটো বড় নোংরা ছিল। মাগো, নোংরা আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে। বলিয়া বিধু শিহরিয়া উঠিল।—গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে; আমার কাজে নোংরামো পাবে না, বৌ-ঠাকরুণ, এ তোমার বলে দিলুম।

মীরার মনেও সন্দেহ ছিল না যে, বিধু আর যা-ই হোক, নোংরা সে নয়।

—কবে থেকে লাগ্‌বে?

—ও বেলা থেকে আস্‌ব খ'ন; কাপড় দু'খানা নিয়ে আসিগে।

—কোথায় থাক এখানে?

—গাঁর সম্পর্কে আমার এক পিসি থাকে কম্বলিটোলায়, তারি কাছে থাকি; বড় ভাল লোক।

বিধু বহাল হইয়া গেল।

কিন্তু বিকালে আসিয়াই বিধু নিরতিশয় কুণ্ঠিত ভাবে একখানা আস্ত কাপড়ই চাহিয়া বসিল। বলিল, তা' কি আগে জানি, বৌ-ঠাকরুণ, যে এমন কাণ্ড হ'য়ে আছে, বজ্জাত ধোপা দুখানা কাপড়ই ছিঁড়ে একেবারে ময়দান করে দিয়েছে। তোমার এখান থেকে গিয়ে প্যাঁটরাটা খুলে কাপড়ের পাট্‌ খুলে' আমি একেবারে অবাক্‌; মোটে দু'ধোপের কাপড়খানা—যেন হা হা কর্‌ছে! আর একখানা খুল্‌লুম, সেখানারও সেই দশা।—রাস্তা ঘাটে বেরুতে হবে, বাবু থাক্‌বেন বাড়ীতে—

বিধু থামিল।

এবং তাহার এই সকাতর অনুচ্চারিত মর্ম্মবাণী যথাস্থানে ঘা দিল। নারীর লজ্জা নারী বুঝিবে না ত' বুঝিবে কে? সুতরাং দ্বিধাহীনচিত্তে নিজের একখানা কাপড় মীরা লজ্জানিবারনার্থে বিধুকে তৎক্ষণাৎ দিয়া দিল। মীরার দানের হাত দেখিয়া বিধু কৃতজ্ঞতায় একেবারে অশ্রুমুখী হইয়া উঠিল। বলিল, বৌঠাকরুণ, আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরটা কাল তোমারই পায়ের তলায় পড়ে' কাটিয়ে দিতে পারি; আমার আর কোনো সাধ নেই।—

শুনিয়া মীরা লজ্জা পাইল।

পরদিন সমস্তটা দিন ধরিয়া বিধু কিন্তু চরম অপটুত্বেরই পরিচয় দিল।

বিধু বলিয়াছিল, আমিও গেরস্ত ঘরের মেয়ে, বৌ-ঠাকরুণ; গেরস্তালীর কাজ আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু এই দর্প সত্ত্বেও পদে পদে তাহাকে গৃহস্থালীরই কাজ বুঝাইয়া দিতে দিতে মীরা ক্লান্ত হইয়া উঠিল। গুণের মধ্যে তার এইটুকু দেখা গেল, ভুল দেখাইয়া দিলে আগেকার সারদার মত সে রাগ করে না, অপরাধ মানিয়া লইয়া সসঙ্কোচে বার বার করিয়া ক্ষমা চায়।

মীরার স্বামী প্রফুল্ল প্রোমোশনের উল্লাসে অনেকগুলি পরীক্ষায় বসিয়াছিল, কিন্তু বারম্বার অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাহার দেহের মাংস বহুল পরিমাণে ঝরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে উন্নতি হয় নাই। তাহার আফিসের ভাত টাইম্‌ মত চাই। মীরা পুনঃপুনঃ এই দরকারী কথাটি

সমঝাইয়া দিয়া বিধুকে রোজ অতি ভোরেই আসিতে বলিয়া দিয়াছিল ; দু'দিন সে যেন ঘড়ি ধরিয়া ঠিক্ পাঁচটার সময়ই আসিয়া হাজির হইল ; কিন্তু তৃতীয় দিনে সে আসিল বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময়, এবং আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল ; তার চোখের কোণে জল টল টল করিতে লাগিল।

—বৌঠাকৃরুণ, এবারকার মত মাপ কর, আর কোনো দিন এমনটি হবে না।—

সেদিন প্রফুল্লর পুরা খাওয়া ত' হইলই না, উপরন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া সব কাজই এমন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল যে, মীরার মনে কিছুমাত্র শান্তি রহিল না।

বিধু লুকাইয়া লুকাইয়া কেবলই হাই তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, নতুন ঝি কাজ করছে কেমন ?

মীরা বলিল, আলসে, আর কাজ জানে না।

—নতুন লোক, শিখতে কিছুদিন লাগ্‌বে! নোংরা নয় ত ?

—না। বলিয়া মীরা ভ্রুভঙ্গ করিল।

আরও তিনদিন যাইতে না যাইতে বিধুর আরও অনেক-গুলি বদ্ অভ্যাস প্রকাশ পাইল।

সে ঘর ঝাঁট দিয়া আবর্জ্জনা বাক্সর আড়ালে লুকাইয়া রাখে।

প্রথম যেদিন তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইল, সেদিন বিধু চম্‌কিয়া উঠিয়া অপরাধ সটান অস্বীকার করিল ; বলিল, তোমার সেই পুরণো ঝি-দের কাজ, বৌ-ঠাকৃরুণ, আমি কি ও-কাজ করি! রাম, রাম! কি যে বল, বৌ-ঠাকৃরুণ!—তারপর গৃহস্থের কল্যাণ এবং পরিচ্ছন্নতার যোগ সম্বন্ধে এমনই সারবান্ বক্তৃতা করিল যে, মীরা তাহার বার আনাই বুঝিতে পারিল না।…

বিধু যখন তখন আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়ে, অথবা বসিয়া বসিয়া ঝিমায়।…

হঠাৎ একদিন মীরা শুনিল, বিধু অনুচ্চকণ্ঠে গান গাহিতেছে, গানের যে কলিটা মীরার কানে গেল সেটার অর্থ যতই ঘোরালো হোক্ বিধু যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ইহা বিশ্বাস্য নহে ; এবং পুরুষকে উদ্দেশ করিয়া যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে প্রেমিক হাজার বেহায়া হইলেও কানে আঙুল দিতে বাধ্য।…পুরুষজাতি নাকি ভারি কপট, তাদের দুর্ব্যবহারের শেষ নাই!

খাওয়া লইয়া যে মুস্কিল বাধিল, তাহার কোনো প্রতি-কারই নাই! নির্ধনের সংসারে শাকান্নও কোনোদিন প্রস্তুত হয়, কোনোদিন আয়োজন বেশীও থাকে। কিন্তু শাকান্নের দিন বিধু এমন ভাব ধারণ করে যেন মীরা লজ্জা পাইবে বলিয়াই সে খাইতেছে, নতুবা এই সব সামগ্রী গলাধঃ-করণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি তার নাই। অথচ আহারের উপকরণের অপ্রাচুর্য্য দৈন্য সম্বন্ধে মীরা কিছু বলিতে গেলেই সে বাধা দেয় ; বলে, আমি কি জানি নে, বৌঠাকৃরুণ, গেরস্ত ঘরে কি সবদিন সমান হয় ? তুমি কিছু ভেব নি, আমি বেশ খাচ্ছি। বলিয়া দুই তিন গ্রাস ঘন ঘন মুখে তোলে।

মীরার খুঁৎখুঁতি অসন্তোষ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।—ঝাঁট দেওয়া ঘর তাহাকে ঝাঁট দিতে হয় ; মাজা বাসন তাহাকে মাজিতে হয়, কয়লা নামাইয়া আবার কয়লা সাজাইয়া দিতে হয়, কথায় কথায় বিধু মিথ্যা কথা বলে, নিজের বলা কথাই পরক্ষণেই অস্বীকার করিয়া মীরাকে এমন অপ্রস্তুত ফেলে যে, তাহা বলিবার নয়, ইত্যাদি।

প্রফুল্লর সম্বন্ধে বিধুর আচরণ গৃহস্থঘরের ঝিয়ের পক্ষে একেবারে নির্দ্দোষ। এ-দিকে সে ভাল। ঠেলিয়া পাঠাইলেও সে প্রফুল্লর সম্মুখে যাইতে চাহে না ; বাধ্য হইয়া যাইতে হইলেও এম্‌নি সতর্কতার সহিত গায়ের মাথার কাপড় সামলাইয়া লইয়া জড়সড় হইয়া যায় যে, কাহারও মনে করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু একদিন তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

মীরা মামার বাড়ী গিয়াছিল।—

বিধু আসিয়া প্রফুল্লর ঘরের দুয়ারে চৌকাট ঘেসিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল কাগজ দেখিতেছিল ; সে চোখ তুলিতেই বিধু বলিল দাদাবাবু, বৌঠাকৃরুণ ত আমার কাজ পছন্দ কর্‌ছেন না!

প্রফুল্ল বলিল, তুমি ত কাজ ভাল কর্‌ছ না।

বিধু অত্যন্ত ম্লান হইয়া বলিল, কিন্তু আমি ত প্রাণপণ কর্‌ছি ; মায়ের কাছে মানুষ হই নি কি না, তাই কাজ আমি ভাল করে শিখ্‌তে পাই নি। বৌ-ঠাকৃরুণকে যদি বলে দেন—বলিতে বলিতে বিধু ভিতরের দিকে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিল।

প্রফুল্ল অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কাগজের দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমি তাকে বলে দিয়েছি, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে!

—দিয়েছেন? বলিয়া বিধু ফিক করিয়া একটু হাসিল। বলিতে লাগিল, বড়ই উপকার করেছেন, আমি ভয়ে আর বাঁচি নে। যাক্‌ ভয়টা আমার গেল। আপনারা দুটিতে বেশ আছেন; আমার—

—যাও, এখন নীচে যাও।

—যাই। বলিয়া বিধু ফির্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার শরীরটে ভাল দেখ্‌ছি নে, অসুখ—

—না, আমার কোন অসুখ নেই। তুমি যেতে পার।

বিধু চলিয়া আসিল এবং দরজার কাছেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত তরলনেত্রে প্রফুল্লর দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া নামিয়া গেল!

ইহার পর আরও দু'দিন গেল, এবং তিনদিনের দিন বিধু বিকালে আসিল না; কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন সে আসিল তখন তাহার মুখে যে কিসের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে তাহা মীরার ঠাহরই হইল না।

সেই তার শেষ আসা।

ছ'মাস পরে একদিন সন্ধ্যা রাত্রে প্রফুল্ল একটি অন্ধকার গলির মুখে আসিতেই একটি কুতুহলী নারীকণ্ঠের প্রশ্নে সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—বাবু, এদিকে কোথায় গেছলেন?

প্রফুল্ল মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বিধু! আরও দশজনের সাথে সে দাঁড়াইয়া আছে, হাতে সিগারেট, মুখে হাসি।

বনস্পতির মৃত্যু

[ব্লাডিশ্লাস্ রেমণ্ট]

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[বাংলা দেশে এক দল তরুণ সাহিত্যিক উঠ্‌ছেন—যাঁদের প্রবীণ সাহিত্যিকগণ বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। এই তরুণদলের অনেকগুলি ত্রুটি আছে। ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। তাঁদের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ আছে যে, তাঁরা সাহিত্যের আদর্শের জন্ত নাকি সাগর পারের দিকে চেয়ে থাকেন। নূতন নূতন বিলাতী ও য়ুরোপীয় নামের মোহ এই তরুণদলকে ঘিরে আছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তরুণদলের হয় ত বলবার কিছু নেই। কিংবা থাকলেও তরুণের দল থেকে কেহই তা মাসিক পত্রিকার রাজসভায় সাহস করে জোরে বলেন নি।

সাহিত্যের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এই রকম সন্ধিস্থল সময়ের অনিবার্য্য নিয়মে আসে। প্রবীণের রিক্ত পুঁজির রহস্তের অন্তরালে, শঙ্কা ও সাহস, ভুল-ভ্রান্তি ও গতিবেগ নিয়ে তখন তরুণের দল আসে। এই তরুণের দল সর্ব্বকালের সর্ব্ববিষয়ের ইতিহাসে এক চমৎকার উপেক্ষিত জিনিষ। মানবের ক্রমোন্নতির ইমারৎ গড়ে তোলবার মাল-মশলা জোগায় এই সন্ধিকালের তরুণের দল। আকাশ-ছোঁয়া ইমারৎ গড়ে ওঠে; কিন্তু ইমারতের অন্তরালে তারা লুপ্ত হয়ে যায়।

এই তরুণের দল ছুটী বড় আকর্ষণের মাঝখানে আসে। তাদের অশান্ত গতির মধ্যে নিঃশেষিত যুগের মৃত্যুর পদ-ধ্বনি বাজে; আবার অনাগত যুগের নব-জীবনের স্বপ্ন তাদের আলো ও বাতাসের মত ঘিরে থাকে। তারা শুধু পথ। তার বেশী গৌরবের তাদের কিছু নেই। তারা পৌছে দেয়—প্রবীণকে শ্মশানে; তারা ডেকে আনে, নব-জীবনকে নব-যুগের বাসরে।

তাদের স্বল্পায়ু জীবনের কঙ্কাল দিয়ে যে পথ তৈরী হ সেই পথ দিয়ে আসে নব-যুগের রাজ-অধিরাজ। তার নব-যুগের কেহই নয়। অতীতের শ্রান্ত প্রাণের বোঝা ভার তারা কাঁধে-পিঠে বয়; অনাগতের মৃদু আলে যৎটুকু তারা পায়, তারা চোখে মুখে ধরে নেয়। হয় ত সে আলোয় কিছু পড়া যায় না। সে উষার আলো। সে শু বলে দেয় যে, একটী দিনের রাত শেষ হল—আবার আ একটী দিনের আলো জ্বলে উঠ্‌ল বলে।

মনে হয়, বাঙলার তরুণদল আজ শুধু পথ তৈর করছে তারই জন্তে, যে এসে মহা-প্রাণানন্দে নবীনের জয় গান গাবে। যত দিকে, যত ভাবে ডাক আসছে আজ সে আপনার মধ্যে তাকে ডেকে নিয়ে শোধন করে দিচ্ছে অনাগত কালের হাতে। সে যদি আজ উদাসীন থাকে তবে হয় ত নব-জ্যোতিষ্কের আগমনীর লগ্ন পিছিয়ে যাবে। পেলে বা গঞ্জনা, থাকলেই বা ভুল-ভ্রান্তি, পথ ত তৈরী হবে!

আজ তাই তরুণ বাঙালীর মধ্য দিয়ে, দেখি সেই শোধ ক্রিয়া চলেছে। মহাদেবের মত সে যুগসিন্ধু-মথিত সম হলাহল আপনার মধ্যে নিতে চায়; কিন্তু হায়, তার ঐশ্বর্য্য নেই যে, সে হলাহল সে আত্মস্থ করে নীলকণ্ঠ হয় তবুও সে হলাহল সে পান করে। তাহার নীল-মৃত্যু সাধনায় কমলাসনা লক্ষ্মী জাগে!

যদি য়ুরোপের সাহিত্য তরুণ বাঙালীকে টেনে থাকে—তার নিদারুণ প্রয়োজন আছে। সাহিত্যের সপ্ত-সিন্ধু জল আজ মঙ্গল-ঘটে ভরা চাই—নইলে অভিষেক হবে কি করে!

য়ুরোপের সাহিত্য আজ একটা কথা তরুণ বাঙালীর কানে খুব করে বলে দিচ্ছে যে, মানুষের দাম অনেক বেড়ে গেছে, তোমরা সে কথা ভুলে গিয়েছ। বাঙালীর ছেলে সে কথা শুনে অবাক্ হয় নি, তবে অনুতপ্ত হয়েছে। কেন না তারই দেশে তার মহাপুরুষ মহাকবি মানুষের জয়গান গেয়ে বলে গেছে—

"শুন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে সত্য নাই।"

তবে সে অনুতপ্ত হয়েছে। কেন না, তারই চারিদিকে মানুষের নিত্য অপমান চলেছে।

য়ুরোপের সাহিত্যে রোমান্টিক ধারাকে ছাপিয়ে যে realistic ভাবের ধারা বইছে—মনে হয় তার অন্তরে এই কথাটাই আছে যে, আজ আমরা সমগ্র মানুষকে স্বীকার করতে শিখেছি। আমরা আর আর্থারের রাজ-সভায় মানুষ খুঁজে বেড়াই না; আর মানুষ পেলেও তার নিশীথের স্বপ্নটুকু নিয়ে রূপকথার স্বপ্নজাল শুধু বুনি না; আমরা আজ দেখি জগৎ-ভরা মানুষ; যে মানুষ মাটী চযে—যে মানুষ মোট বয়—যে মানুষ মস্তিক হাতে করে না খেতে পেয়ে মরে যায়—যে মানুষ কারাগারে পড়ে মুক্তির স্বপ্ন দেখে—আজ তারা আমাদের সাহিত্যে বেঁচে উঠেছে। একই প্রেমের নেশায়, একই লোভের উন্মাদনায়, একই ক্ষুধার তাড়নায়—সমগ্র মানুষ চলেছে। মানবতার সংজ্ঞা ও মহিমা আজ বেড়ে গেছে। আমরা আজ জেনেছি যে, প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে অগাধ রহস্য আছে। সে চাষা হোক্, সে মুটে হোক্, সে ঘৃণ্য পাপী হোক্।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে realistic movement এই কথাই বলে।

আজ তাই য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা যাদের খবর পাই তারা চিরকালই ছিল জগতের অপরিচয়ের নির্ব্বাসনাগারে। আজ তাদের মধ্য থেকে মহাকাব্যের ও কাব্যের উপাদান মানুষ বের করেছে।

সামান্য মানুষের সামান্য কথার ও জীবনের মধ্যে অপূর্ব্ব রূপ লীলা ফুটে উঠে। পোলাণ্ডের অমর সাহিত্যিক রেমণ্ট পোলাণ্ডের কৃষাণদের জীবন নিয়ে যে গদ্য মহা-কাব্য রচনা করেছেন—তা এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পোলাণ্ডের নামের সঙ্গে জগতের সভ্যতার একটা বিশিষ্ট যোগ আছে। আকাশ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যতম আদি-জনক কোপার্নিকস্, স্বাধীনতার মূর্ত্ত বিগ্রহ কস্‌কুইস্‌কো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সিন্‌কেউচ্ পোলাণ্ডেরই সন্তান। পোলাণ্ডের স্বাধীনতার সংগ্রামে জেনারেল পিল্‌সুড্‌স্কীর নাম আজ বিশ্ব-বিখ্যাত পেডেরুস্কীর সঙ্গীত ও বেহালাবাদন ইতিহাসের কথা হয়ে গেছে। রেমণ্টের "কৃষাণ" পোলাণ্ডের গৌরবকে আজ জগতের সভায় উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরেছে। সময়ান্তরে রেমণ্ট মহাশয় ও "কৃষাণ" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারব বলে আশা করি।

রেমণ্টের চারখণ্ড "কৃষাণ" একখানি অপূর্ব্ব জিনিষ। রেমণ্ট চাষীদের জীবন নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে মহাকাব্য লিখেছেন। তাঁহার লেখায় প্রকৃতি ও মানুষ এক অপূর্ব্ব সহজ ও সত্য ভাবে ফুটে উঠেছে। সহজ মানুষের মনের গহ্বরে সমস্ত রসই ঘন হয়ে আছে; এক নিবিড় অজ্ঞাত বন্ধনে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা;—রেমণ্ট নিজে মাটীকে অগাধ ভালবাসেন, যেমন ভালবাসত তাঁর নায়করা। রেমণ্টের সাহিত্যে দেখি নির্বাক প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে। রৌদ্র ও বর্ষা, রাত্রি ও দিন, বন ও সিন্ধু, আকাশ ও আলোর মধ্য থেকে একটা মন্ত্রশক্তি জন্মগ্রহণ করে মানুষের গতিবিধির অজ্ঞাত নিয়ন্তারূপে রয়েছে। বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠগণ আজ জড় জগতের অন্তরালে প্রাণের স্পষ্ট প্রমাণ কলে ধরেছেন; সাহিত্য-শ্রেষ্ঠগণ ধ্যানে ও দর্শনে জড় জগতের অধিষ্ঠাতা প্রাণ-ভগবানের রূপ দেখেছেন। রেমণ্টের সাহিত্য এই কথাই মনে করিয়ে দেয়। "বনস্পতির মৃত্যু"র কাহিনীতে আমরা এই কথারই পুনরুক্তি দেখ্‌তে পাই। রেমণ্টের "বনস্পতির মৃত্যু" টলষ্টয়ের অপূর্ব্ব গল্প "Three Deaths"—

এর কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। উদার দার্শনিক-কবি টলষ্টয় এই গল্পে মৃত্যুর বন্ধনীর সাহায্যে অপূর্ব্ব সহজ-কৌশলে সমস্ত সৃষ্টিকে একটা অখণ্ড প্রাণ-প্রতিমার অন্তর্ভুক্ত করে দেন। রেমণ্টও "বনস্পতির মৃত্যু"র কাহিনীতে মাটীর প্রেমের বন্ধনীর মধ্য দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর রক্তের ধারার একটা সাক্ষাৎ যোগসূত্রের দর্শন পেয়েছেন। আমাদের এই ধরণী-প্রবাসের মৌন সাথীরা আমাদের অহরহ ডাকে—,আকাশ থেকে আলো ও আঁধারের পথ বেয়ে বর্ষা শরতে, শীতে বসন্তে কত ডাক আসে, বনের বুক থেকে, মাটীর ভিতর থেকে দেবতা ডাকে; সে আহ্বান আমাদের কবির বীণায়ও বাজে। সেই সব ডাকে সাড়া দেওয়া মানেই জীবনের বিকাশ।]

বনস্পতির মৃত্যু

(গল্প)

ঘর ছাড়া

হ্যাঁ গা, উঠ না! মদ খেয়ে মড়ার মত পড়ে আছ! আর আমি বাঁদীর মত খেটে খেটে মরি! পোড়া কাজেরও কামাই নেই। র‍্যাফেল এই এল বলে। সে এসে বাঁধা-গোছায় আমার সঙ্গে হাত লাগাবে'খন। একবার ওঠ না—হ্যা গা—

স্বামী মদ খাইয়া বেহুঁস অবস্থায় খড়ের গাদায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। স্ত্রী আসিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দূর হ মাগী—

এবার স্বামীটী দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

মাগো! কি করি! জিনিষ-পত্তর সব বাইরে টেনে আনতে হবে, তা না হলে গাড়ী বোঝাই হবে কি করে? এখনও ময়দাগুলো বস্তায় তোলা বাকী রয়েছে,—আলুগুলো ভাঁড়ার থেকে বের করতে হবে। মাগো, কি হবে, কত কাজ পড়ে রয়েছে আর এ-ধারে পোড়া পায়েও আর জোর পাই না। আর ও-ধারে কোথায় উনি আমা'কে একটু সাহায্য করবেন, না পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন।

বিফল মনোরথ হইয়া স্ত্রী আওয়া সজোরে ও ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, উঠলে না? ভাল হবে না বলছি।

স্বামী তেমনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে অলসভাবে উত্তর করিল, দূর হয়ে যা আমার কাছ থেকে—

তারপর উপুড় হইয়া খড়ে মুখ গুজিয়া অসাড় হইয়া রহিল। স্ত্রীর অশ্রু ও মিনতি বিফল হইয়া গেল।

বিদায়ের ব্যথা

স্ত্রী ঘরের আসবাব-পত্র বাহিরে টানিয়া আনিয়া দেওয়ালের ধারে গোছাইয়া রাখিতেছিল। একটা দেব-মূর্ত্তির ছবি সযত্নে কাগজে মুড়িতে মুড়িতে সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল, হায় রে পোড়া কপাল! সেই ছেলেবেলায় কবে বাপ-মা'র কোল হারিয়েছি। আর আজ ভিখারিণীর মত ঘরদোর ছেড়ে কোথায় চলেছি—আর এই কি সময় ঘর ছাড়বার। এই দারুণ দুর্য্যোগে মানুষ যে কুকুরটাকেও দূর করে দিতে পারে না। আর হতভাগিনী চাষার মেয়ে, কে তাকে দেখে! এই নিদারুণ পৃথিবীতে একলা তাকে পথে কাজের জোগাড়ে বেরোতেই হবে।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে বনের ধারের কর্দ্দমাক্ত পথের দিকে চাহিল। বনেতে তখন গাছ কাটা শুরু হইয়া গিয়াছে। সে র‍্যাফেলের জন্য দাঁড়াইয়া আছে, কেন না জিনিষ-পত্র সে-ই তো আর গাঁয়ে পৌঁছে দেবে। কিন্তু পথে কোনও মানুষের দিশা নাই—শুধু জমাট কুয়াষা আর ঘোলাটে পুকুর চোখে পড়ে।

উঠান হইতে সে একবার তাহার পরিচিত কুটীরখানির দিকে চাহিল। দীর্ঘশ্বাসে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে সে ঘরের পিছনে গরুটাকে দেখিতে চলিল।

ইহারই মধ্যে সে ঘরের সামনে জিনিষ-পত্র অনেক টানিয়া বাহির করিয়াছে,—একখানা মই, একটা হলদে রঙের ফুলের সাজি, দুএকটা লাল ফুলও তার মধ্যে আছে, কতকগুলো ভাঙ্গা চেয়ার, একটুকুরো নীল টেবিল-ঢাকা কাপড়, দু'একটা বেঞ্চী, একটা ছোট টেবিল, টেবিলটার উপরে মাল্যবিভূষিত একটী ক্রশ, কতকগুলো ফল, দু'এক পোঁটলা

আলু, খড়ের ছটো বিছানা—এই সমস্ত এলোমেলো জিনিষের মাঝখানে মাটীর উপরে একটী বৃহদায়তন কৃষ্ণবর্ণের শূকর শুইয়া আছে, শূকরটার একটী পা গাছের সঙ্গে বাঁধা।

গরুটীকে আদর করিতে করিতে সে ডাকিল, ওরে আমার সুবলা ওরে সুবলা!

সুবলা করুণ রেখায় গলাটী বাড়াইয়া দিয়া পালয়িত্রীর উন্মুক্ত অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। পালয়িত্রীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি সুবলার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর সামনে মুরগীগুলোর তদারকে গেল।

মুরগীগুলোকে এক জায়গায় জড় করিবার জন্য সে এক মুঠো কড়াই ছড়াইয়া দিল। তারপর একে একে ডানা বাঁধিয়া তাহাদের ঝুড়িতে পুরিল। আবার সে ফিরিয়া পথের দিকে চাহে। এবার পথে গ্রামের দিক হইতে একটী বালিকার রেখা-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

মা ও মেয়ে

গলা জোর করিয়া মা মেয়েকে ডাকিল, ছুটে আয়—ছুটে আয় রাক্ষুসী!

মেয়েটীর পায়ে কোনও পাদুকা ছিল না; তবে সারা গা সে এমন ভাবে ঢাকা দিয়া ছিল যে, শুধু তাহার মুখের একটুখানি মাত্র দেখা যাইতেছিল। সেটুকু মুখ শীতার্ত্ত ও মলিন।

তাড়াতাড়ি সে মায়ের সম্মুখে বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে এক বোতল ব্রাণ্ডী, কয়েকখানা রুটী ও একটা তৈরী মাংসের কৌটা বাহির করিয়া দিল।

এতক্ষণ কোথায় ছিলি, রাক্ষুসী! আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল কোথায়?

তাই হবে! কি রকম জোরে বৃষ্টি নেমে এল; আর আমি ভয়-পাওয়া কুকুরটার মত ছুটে ছুটে আসছি,—উনি বলেন কি না আড্ডা!

শীতে মেয়েটীর হাত পা কালো হইয়া গিয়াছিল। সে জোরে জোরে হাত পা ঘষিতে লাগিল।

আড্ডা দিয়ে আসা হল—আবার কথা!

বলিয়াই মাতা কন্যার পৃষ্ঠদেশে যথোচিত পুরস্কার বর্ষণ করিল।

ক্ষুব্ধ হইয়া মেয়েটী উনানের একাপাশে গা হাত পা গরম করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। উনানে তখনও দুই একটী কয়লা লাল হইয়া জ্বলিতেছিল।

ও-ধারে মা আবার ঘরের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘরের আর সব আসবাব-পত্র সে একে একে বাহিরে আনিয়া ফেলিল। তার ঘরের সামনের একটা খোলা জায়গা পার হইয়া শেষ কয়েক গাছি তৃণগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া সে সুবলার মুখে দিল। যন্ত্র-চালিতের মত সে উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল দুই হাতে মুছিয়া ফেলিল।

ঘর হইতে পথে

কখনও সে সহসা থামিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাতে মাথা চাপিয়া নিরুদ্ধ শুষ্কতায় বলে, হায় ভগবান! হায় ভগবান!

ভয়ে ও বেদনায় তাহার অন্তর ঘন ঘন দুলিয়া উঠে। সে ভাবিয়া আকুল হইয়া যায় যে, কেমন করিয়া এত দিনের এই ভিটে মাটী আজ সে ছাড়িয়া যাইবে।

স্বামীটী তখনও শুইয়াছিল, তবে সে মাঝে মাঝে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল। আর আরক্তিম চক্ষু দুইটী রগড়াইয়া আরও আরক্তিম করিতেছিল। এত জোরে তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছিল যে, তাহার কুকুরটী ছুটিয়া তাহার পাশে আসিয়া জামা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন প্রভুর মন ফিরাইতে পারিল না তখন সে ধীরে ধীরে উনানের ধারে প্রভু-কন্যার পাশে শুইয়া জ্বলন্ত কয়লাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

র‍্যাফেল যখন দুটী মুমূর্ষু ঘোড়াসুদ্ধ গাড়ী লইয়া আসিল তখন রাত্রির ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে।

তিনিই মঙ্গলময়, বলিয়া র‍্যাফেল বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

স্বামী শয্যা হইতে উঠিয়া অভিবাদন করিল, তিনিই মঙ্গলময়—যুগ হতে যুগে···এসেছ ভাই, ধন্যবাদ।

ওসব কিছু নয়! তবে বাইরে দুরন্ত বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তা-ঘাট তো কাদায় ভরে গেছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া বইছে।

তা—আমাদের যদি ভোর বেলা গাঁয়ে পৌছতে হয় তা হলে এখনই রওনা দিতে হয়!

'নিশ্চয়ই'

র‍্যাফেল ঘরের এককোণে ছড়িটী রাখিয়া একবার দুই হাত বেশ করিয়া ঘষিয়া লইল, তারপর উনানের কাছে যাইয়া ফুঁ দিয়া ছাই উড়াইয়া এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা নিভে-যাওয়া পাইপে ভরিয়া লইল। তখন ও-ঘরের মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুক পড়িয়াছিল। র‍্যাফেল তাহার উপর বসিয়া পাইপ খাইতে লাগিল।

গৃহস্বামিনী জানালার উপর রুটী, বোতলটী আর মাংস আনিয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা দুজনে খেয়ে নাও।

মাংস ও মদের গন্ধে স্বামী সজাগ হইয়া বলিল, তোমার এত কষ্ট করবার কি দরকার? এস র‍্যাফেল,—

'তথাস্তু'

তারপর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া গৃহস্বামী বলিল, তুমিও এস, একটু কিছু খেয়ে নাও,—

গৃহস্বামিনী পিছন ফিরিয়া আড়াল করিয়া সামান্ত পান করিল। কৃষাণ দুইটী পূরা মাত্রায় আহার করিতে লাগিল।

জমিদার এই বন বিক্রী করে শ্যাম্‌পেনের পয়সার জন্যে; আমাদের শ্যাম্‌পেন না জুটুক্—ব্রাণ্ডীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত...

তা তো সত্যি। কিন্তু আজ থেকে আমাদের সমস্তই কিনতে হবে—একটা ছড়ির দরকার হলে তাও কিনতে হবে।

র‍্যাফেল আপন মনে আবার বলিয়া চলিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বনটা তার গাছপালা নিয়ে বেঁচে ছিল—ততক্ষণ কিসের ভয় ছিল? সুখে হোক, দুঃখে হোক, শুক্‌নো ডাল কুড়িয়ে আগুন জ্বালা তো যেত, গাছে তো ফল ছিল—চাও তো দুটো একটা পাখী কিংবা খরগোস মার। আজ আর তা হবে না। বরাত, পোড়া বরাত্!

যাক্, আর একবার গেলাস ভরে দাও। বুরেক, আয় ব্যাটা কুকুর, এই মাংস খা। খুব আহ্লাদ, না—যে তোর মনিব আজ বিশ বছরের দাসত্বের পরিশ্রমের বিনিময়ে পথে দাঁড়াল,—

কুকুরটি একবার বীভৎসভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, যেন সে তার মনিবের কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

গৃহস্বামিনী তখন দরজার উপর দেহের ভর দিয়া কাঁদিতেছিল।

র‍্যাফেল ধীরে ধীরে বলিল, যাক্, একবারের বেশী তো আর মরতে হয় না! যার নৌকায় চলেছি, সে যদি না চায় তবে মাঝদরিয়াতেও নেমে যাওয়া ভাল!

পাইপটা ঠুকিয়া সেটাকে পরিষ্কার করিতে করিতে র‍্যাফেল বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর তাহারা সকলে মিলিয়া জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল। নীরবে, কেহ কাহারও দিকে চাহিল না। গোছান শেষ হইলে র‍্যাফেল দড়ি দিয়া সব বাঁধিতে লাগিল। গৃহস্বামিনী তখন বাড়ীর ভিতর গিয়া গরুটীকে লইয়া আসিয়া মেয়ের উপর লইয়া যাইবার ভার দিল।

মেয়েটী বেশ করিয়া কাপড়ে গা হাত পা ঢাকিয়া গরুটীকে লইয়া পথে নামিল। ভাষাহীন জন্তুটী বাধা দিল। কুটীরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মেয়েটীকে ঘিরিয়া সে চীৎকার করিতে লাগিল। র‍্যাফেল ডাকিয়া বলিল, তা হলে এইবার যাত্রা করা যাক্।

শেষ দেখা

গৃহস্বামী উত্তর দিল, হাঁ, যাত্রা করা যাক্।

তবুও সে একবার হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিল। তাহার পিছনে তাহার স্ত্রীও আসিল। তাহারা দুইজনে দুইজনার দিকে মৌন বিষাদে চাহিয়া রহিল। অকারণে মেঝের খড়গুলি একবার তুলিয়া ফেলিল—উদাসভাবে দেয়ালটী পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তটীকে কেমন করিয়া এড়ান যায়?

র‍্যাফেল ডাকিয়া বলিল, অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে—চল, যাত্রা করা যাক্।

স্বামী স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বলিল, চলো গো—যাই—ভারী বিশ্রী এ সব—তবে হয় ত আবার সব বদলে যাবে—

কথা শেষ করিয়া সে তার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া সজোরে পিছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তুমি ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজমান—তুমি পিতা, তুমি সন্তান, তুমি অধিদেবতা, তোমারই জয় হ'ক!

গৃহস্বামী ওভার-কোটটা গায়ে বেশ টান করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া পথে নামিয়া আসিল। পিছনে স্ত্রী শূকরটা টানিয়া লইয়া আসিতেছিল। অশ্রু তাহার সমস্ত বেগ ভাঙিয়া বহিতে লাগিল।

বেদনাময় স্মৃতি

গৃহস্বামী বনের ধারের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। পথের পাশে মৃত অরণ্যানীর কঙ্কালের মত রাশীকৃত কাষ্ঠ। তাহার সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এই বনের সে প্রত্যেক পায়ে-চলা পথটী চিনিত -এর প্রত্যেক গোপন কক্ষটী যে তাহার জানা ছিল। জীবনের সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া সে এই অরণ্যানীর সেবা করিয়াছে। সেবার অন্তরালে কখন অজ্ঞাতে সে এই বনানীর সহিত বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। দীর্ঘজীবন ধরিয়া ঐ লুপ্তপ্রায় বৃক্ষগুলি দিনের পর দিন ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুতের আর বজ্রের আঘাত নীরবে সহিয়া বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু আজ প্রমাণ হইয়া গেল যে, বজ্র আর বিদ্যুতের চেয়েও তীব্র লৌহের কুঠার। তাই আজ লৌহের আঘাতে বনানীর হৃৎ-স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। কাদায় চলিতে চলিতে সে একবার মজুরদের হাতের কুঠারের দিকে চায় আর একবার কাঠ-ভরা গাড়ীগুলির দিকে চায়। চোখে তার হতাশ উন্মাদনা জাগিয়া উঠে। তাহার মনে হইতেছিল যে, লৌহের ঐ এক একটী আঘাত তাহারই অঙ্গের উপরে পড়িয়াছে। লৌহ তাহার অন্তরাত্মাকে আঘাত করিয়াছে। তাহার সাধ যাইতেছিল যে, সে চীৎকার করিয়া পৃথিবীর সকলকে এই বেদনার কথা জানায় কিন্তু নিরুপায় হইয়া কোনও রকমে নিজেকে পড়িয়া যাওয়া হইতে বাঁচাইবার জন্য সে দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চলিল।

ক্রমশ বৃষ্টিধারা আরও শীতল হইল। বর্ষা ভীষণতর হইয়া আসিল। পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত দুর্ব্বল শাখাশিশুর পীত-গৌরবের শেষ নিদর্শনপত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া রহিল; অদূরে কোথাও কোনও নগ্ন দেওদার বৃক্ষের পত্রপল্লবহীন চূড়ায় বসিয়া একপাল দাঁড়কাক চীৎকার করিয়া বিলাপ করিয়া উঠিল, হায়, আজ হতে নীড় বাঁধা হবে কোথায়!

গোধূলির ম্লান ছায়া মুমূর্ষু অরণ্যানীর নিরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সেই মৃত্যু-মলিন গোধূলি ভয়াবহ অন্ধকার ও জ্বালা লইয়া কৃষকটীর অন্তরে প্রবেশ করিল। রাগে তাহার ইচ্ছা যাইতেছিল যে, সে পথের ধারের ইটগুলিকে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু সে ভয়ে চোখ বুঁজিয়া চলিতেছিল, পাছে মর্ম্মন্তুদ আরও কিছু চোখে পড়ে।

জীবনে মৃত্যু তো শুধু একবার দেখা দেয়—বলিয়া সে সজোরে কতকগুলি শুক্‌নো ডালে লাথি মারিল। তারপর বিশ্রামের জন্য সে একটা ওক্ গাছের তলায় বসিল। এই গাছটীতে লৌহের আঘাত এখনও পড়ে নাই, কেন না ইহার অঙ্গে দেব-মূর্ত্তি আছে। প্রতিদিন এই ওক গাছ পর্য্যন্ত যে বন পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিত! এই গাছটাই বনের শেষ সীমানা। এইখান হইতে প্রতিদিন সে ফিরিয়া ঘরে গিয়াছে—আজ এই পবিত্র বনাঙ্গন ছাড়িয়া সে চিরকালের তরে চলিল। একি নির্ব্বাসন! হায়, মৃত্যু যদি হয়—যদি মৃত্যু হয়—

কৃষাণ বেদনায় শিশুর মত ভাষাহীন ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল।

শেষ

স্ত্রী ডাকিল, ওগো, চলে এসো শিগ্‌গির! ম্যাক্সেল যে আর দাঁড়াতে পারে না। এ-ধারেও যে রাত্রি গাঢ় হয়ে এল!

সে চীৎকার করিয়া উঠিল, দূর হও—নইলে মেরে ফেলবো এখনই।

জ্বালা-বোঝাই করে মদ খাওয়া হয়েছে; এখন বুঝি পথেই পড়ে থাকতে হবে।

চলে যাও, বলছি। নইলে ভাল হবে না।

তা হলে আমি যাই। তুমি রইলে।—বলিয়াই স্ত্রী ধীরে স্বামীর নিকটে যাইয়া ক্রন্দন স্ফীত আরক্তিম দুই চক্ষু তুলিয়া জামার হাতা ধরিয়া টানিয়া বলিল, এসো, এসো গো!

যাও, যাও বলছি, নইলে মেরে হাড়গুঁড়ো করে দেবো। যাও—

স্ত্রী জামা আরও জোরে টানিল। কৃষক এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা শুক্‌না ডাল দিয়া স্ত্রীকে জোরে আঘাত করিয়া টানিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। তারপর আপনি শূকরের দড়িটী লইয়া পথ চলিতে লাগিল। স্ত্রী উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পিছু পিছু চলিল।

অচিরে অন্ধকারে আর নিশীথের কুয়াশায় তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু অন্ধকারে দাঁড়কাকের তীব্র আর্ত্তনাদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। কচিৎ দুই একটা গরু মাঠ হইতে ঘরে ফিরিতেছিল। অন্ধকারে তাহাদের গলায় ঘন্টার শব্দ ও তাহার সহিত রাখাল বালকের অনুনাসিক কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

তারপর সমস্ত নীরব হইয়া আসিল। তিমির-গম্ভীর ধরণীকে মনে হইতেছিল যেন শুধু একটা গতিহীন, অন্ধ, মলিন, তন্তুহীন তরল অন্ধকারের পুঞ্জ!

মাঝে মাঝে শুধু সেই পুরাণো ওক্ গাছটা দুলিয়া দুলিয়া অন্ধকারে শৈবালে শুষ্ক পত্র ঝরাইতেছিল। মৃত্যু-মথিত অরণ্যানীর ব্যথিত অন্তর হইতে শুধু একটা নিরুদ্ধ মর্ম্মর ধ্বনি উঠিতেছিল—

হায়, মৃত অরণ্যানী, হায় মৃত অরণ্যানী!

পুরাতনা

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

৬৮ বছর পূর্ব্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত প্রবোধ প্রভাকর' নামক একখানি গ্রন্থের ভূমিকার আরম্ভটুকু বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যসেবীগণের জন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; সমগ্র ভূমিকাখানি পাঠ করিবার অবসর আজকালকার দিনে কাহারও নাই। গুপ্ত কবির সহজ সরল কবিতার সঙ্গে পরিচয় অনেকরই আছে কিন্তু তাঁহার রচিত গন্ত অনেকের নিকটই অপরিচিত। একই ব্যক্তির লেখা গদ্য ও পদ্য যে কিরূপ তফাৎ হইতে পারে তাহা দেখিবার জিনিষ। বোধ হয় ইহা আপনাদের অনুপভোগ্য হইবে না।

ভূমিকা

"বাক্যবাদিনী বর্ণচারিনী কণ্ঠবাসিনী ভ্রান্তি-নাশিনী ভাব-অর্থ-অভিপ্রায় প্রদায়িণী দ্বিদল-কমল দল-বিহারিনী শ্রীশ্রীমতী দৈবশক্তি দেবীর চরণ-স্মরণ করণ পূর্ব্বক এই "প্রবোধ প্রভাকর" পুস্তক প্রকাশ প্রবৃত্তি পরবশ হইয়া প্রচুর প্রয়াস পরিপূরিত পরিশ্রম ও প্রযত্ন পুরঃসর লেখনী ধারণ করিলাম..."

আবার ভূমিকা শেষের কিছু পূর্ব্বে তিনি জানাইতেছেন —

"এই পুস্তক গন্ত পন্তে পরিপূরিত.হইল ; এই বিষয় দুই প্রকার লিখিবার এই তাৎপর্য্য একবার গন্ত পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার পন্ত পাঠ করিলে তাহার ভাব অর্থ অভিপ্রায়াদি অতি সহজেই পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম হয়নের সম্ভবনা, বিশেষতঃ যাহারা পন্তপ্রিয় তাঁহারা গন্তের পর পন্ত দৃষ্টে আরো অধিক সন্তুষ্ট হইবেন। এই পুস্তকে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে প্রবন্ধটী প্রকটন করিলাম তাহার তাৎপর্য্যার্থ সাধারণের সাধারণ বোধে সহজে সংগ্রহ হইবার নহে ; ফলে শ্রীমান ধীমান পুমান পুঞ্জের পক্ষে কখনও কঠিন হইবে না।"

ইহার কয়েক বছর পূর্ব্বে ইংরেজী ১৮৪৮ সনে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি যত্নে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সদর-দেওয়ানি আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ পুস্তকের আর একটী ভূমিকার নমুনা শুনুন। ম্যাকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত রিপোর্টের এক খণ্ড হ্যালিডে সাহেব পার্শী ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশিত করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার পাঁচ পাঁচ খণ্ড প্রত্যেক জেলার দেওয়ানি আদালতের জন্ত ক্রয় করেন কিন্তু ঐ রিপোর্টের বাংলায় কোন তরজমা হয় নাই—তাই গ্রন্থকার ভূমিকায় আক্ষেপ জানাইতেছেন—

নমঃ শ্রীহেরম্বায়।

বর্য্যার্য্য দীর্ঘ-দর্শি সুধী প্রধী বিধিদর্শি সমগ্রাভ্যগ্রে নিবেদনীয়-মেতৎ—

...কিন্তু যে বঙ্গভাষা দেশের লোকের কথিত ও লিখিত ভাষা এবঞ্চ গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ের চলিত ভাষা, এবম্ভূত বঙ্গভাষয়া ভাষিত রিপোর্ট বহি এই বঙ্গভূমে প্রচারীভূত না থাকাতে এদেশীয় সমাজের হৃদম্বরে মনোদুঃখরূপ নিবিড় মুদির যাহা ব্যাপ্ত ছিল বাঞ্ছিত ফলদানরূপ প্রভঞ্জন দ্বারা দূরাবসরনে বিনীতমননে প্রবৃত্ত হইলাম।...প্রার্থনা এই যে ভ্রমপ্রমাদাদি জনিত মদীয় দোষ দোষজ্ঞ মহেচ্ছগণ স্ব-ছাত্রানু বোধে মার্জ্জনা করিবেন। কিম্বহুনা প্রধীবরেষিতি।

আর একটী লেখার নমুনা—

দৈনিক প্রভাকরের একজন সুহৃৎ ও তরুণ লেখকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও অন্ততম সুহৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র তজ্জন্ত কোন শোক প্রকাশ না করায় তাঁহাকে আক্রমণ—দুই-ই আছে।

প্রিয় মহাশয়! বর্ত্তমান মাসের প্রথম বাসরীয় প্রভাকর পত্রিকায় প্রিয় বন্ধুবর বাবু দ্বারকানাথ অধিকারীর মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করত অজস্র-প্রবাহিত-গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। এই নিষ্ঠুর সংবাদটি কি পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক ক্লেশদায়ক এবং হৃদয়বিদারক তাহা কি কহিব। পাঠাবধি মদীয় বক্ষঃস্থল যাতনানলে দগ্ধ হইতেছে এবং অনবরত শোকাশ্রু নির্গত হওয়াতেও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল না, বরং দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপ প্রবল পবন-প্রবাহে আরো প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে। আহা কি পরিতাপ! ভবদীয় অমূল্য প্রভাকর পত্রিকা প্রাপ্ত মাত্রেই আত্মপান্ত একবার সামান্ত ভাবে বিলোকন করা

মদীয় স্বাভাবিক সংস্কার থাকা প্রযুক্ত উক্ত পত্রিকায় "দ্বারকানাথ অধিকারী" শিরোণামাঙ্কিত প্রবন্ধ সন্দর্শন মাত্রে প্রিয় বন্ধুর কবিত্বগুণের কোন প্রতিষ্ঠা-উৎসব গুণানুবাদ বিবেচনায় একান্ত ব্যগ্রতাপূর্ব্বক পাঠারম্ভ করিয়া ক্রমশই বিপরীত ব্যাপারাবলোকনে নিদারুণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হওত পরিশেষ মর্ম্মবেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইল।...

"অস্মদাদির অনুরোধক্রমে কতিপয় রচনারসিক কবিভ্রাতা ইঁহার বিচ্ছেদবিঘটিত কয়েকটী শোকসন্দর্ভ লিখিয়া প্রেরণ করেন। আহা কি পরিতাপ! আমারদিগের মনের অভিপ্রায় মনেই বিলীন হইল, উদ্দেশ্য বিষয় সুসিদ্ধ হইল না, আমরা লক্ষ লক্ষ ছাত্র মধ্যে এতদ্বিষয়ে যাঁহার দিগ্যে বিশেষ করিয়া লেখ্যরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাঁহারা সখ্যভাবাপন্ন মোক্ষ্যপদপ্রাপ্ত দল-সতীর্থ সহযোগী কবির শোক বর্ণনায় পরাঙ্মুখ হইলেন। মিত্র পুত্র পুরপ্রয়াণকারি মিত্রের মিত্র মিত্র এই কি মিত্রবৎ ব্যবহার করিলেন? অপিচ বাবু বঙ্কিম প্রকৃত বঙ্কিম হইয়াছেন, চট্টগ্রামে বাস করিয়া ভট্টমহাশয় মনের স্বরূপ আক্ষেপ ব্যক্ত করিলেন, ভট্টপল্লীর পার্শ্বে থাকিয়া চট্টবাবু লেখনী ধরিতে পারিলেন না।—"

ইংরেজীর অনুকরণেই আমাদের দেশে বাংলা সংবাদ পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। কাজেই তাঁদের দেখা-দেখি Weather report প্রকাশ করার রীতি বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। এবারের দারুণ গ্রীষ্ম দৈনিকে যেমন নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং মাসিকের ব্যঙ্গ চিত্রে (যথা—জ্যৈষ্ঠের বসুমতী) চিত্রিত হইয়াছে তেমনি গুপ্ত কবিদের আমলে তাঁহারা কি ভাবে গ্রীষ্মের বর্ণনা করিতেন তাহা একটু আপনাদিগকে শুনাইতেছি। এ বর্ণনা এতই দীর্ঘ যে তাহা সম্পূর্ণ শুনাইতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে—তাই এক তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে কিয়দংশ আপনাদের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্! কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত করি। তোমার অপার কৃপার প্রভাবে বর্ত্তমান ঘোরতর ভীষ্ম গ্রীষ্মঋতুর অধিকারে এ পর্য্যন্ত সজীব থাকিয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এই নিষ্ঠুর নিদাঘে অসহ্য সূর্য্যকিরণে সময়ে সময়ে জীবন ধারণের উপায় মাত্রই ছিল না কেবল তোমার করুণা-বরুণালয়ের করুণা-জীবন প্রাপ্ত হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। মধ্যাহ্ন কালে মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড-প্রকাশ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে দিকসকল দগ্ধ হইতেছে। বিশ্বপ্রাণ অনিল অনলস্পর্শে উন্মত্ত হইয়া জলে-স্থলে আকাশ-মণ্ডলে প্রাণিপুঞ্জকে অস্থির ও অজ্ঞান করিতেছে। দেহ নিতান্তই অবশ হইয়াছে। কাহারো বদনে বাক্য সরে না। আই ঢাই করিয়া শুদ্ধ ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বায়ুগ্রহে বায়ু এক একবার আপনার গতিরোধ করিতেছে, তাহাতে শোণিত সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভিতরের রস জলরূপে ঘর্ম্মচ্ছলে অনর্গল গল গল করিয়া নির্গত হইতেছে; ভূমিতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছি, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণ যাই যাই ডাক ছাড়িতেছে। হে নাথ। এমত সময় অতিশয় কাতর হইয়া, কখনো মনে মনে কখনো উচ্চৈঃস্বরে—"হে রক্ষাকর! রক্ষাকর রক্ষাকর রক্ষাকর" এই বলিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, সেই সময়ে তুমি সদয় ভাবে হৃদয়খানে উদয় হইয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক আমার দিগ্যে রক্ষা করিয়াছ। তৎক্ষণাৎ হয় সুশীতল সমীরণ সঞ্চার, নয় সুবৃষ্টির সঞ্চার করিয়া সমুদয় সন্তাপ সংহার করিয়াছ, সৃষ্টির রিষ্টি হরিয়াছ। উপস্থিত গ্রীষ্মে আমরা এইক্ষণে মৃতকল্প হইয়া আবার পরক্ষণেই অমৃত পাইয়া অমরবৎ হইয়াছি।

"এই দুঃসহ দারুণ ঋতুতে তুমি জীবের শিবের জন্য যে সমস্ত উপাদেয় ভোগের সৃষ্টি করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। সুরসাল সুমধুর অমৃত ফল আম্র, কাঁঠাল, জাম, খেজুর, নারিকেল, তাল, তরমুজ, শসা, কদলী, প্রভৃতি অশেষ প্রকার সুস্বাদু সুমিষ্ট শুভকর ফল এবং বহু প্রকার মূল, ইহার প্রত্যেক বস্তুর রসাস্বাদন যখন গ্রহণ করি তখন রসনে সরসে রসিকা হইতে থাকে। উত্তমরূপ আহার দ্বারা ক্ষুধানল যতই শীতল হইতে থাকে, ততই তোমার নিকট কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে থাকি। তুমি এই সময়ে জলকে স্বভাবতঃ এরূপ নির্ম্মল ও প্রিয় করিয়াছ যে, ঘোরতর তৃষ্ণাকালে অঞ্জলিপুরিয়া উদর ভরিয়া যতই জলপান করি, ততই আর তৃপ্তির সীমা থাকে না। পীযূষবৎ প্রিয়বারি পান করিতে করিতে তোমার গুণগান করিতে করিতে জ্ঞান ধরিতে ধরিতে ভাবে অমনি মোহিত হইয়া যাই।"

তখন ফলমূল এখনকার মত দুষ্প্রাপ্য ছিল না, এবং পানীয় জলের

জন্য তাঁহাদিগকে কর্পোরেশনের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত না। কলের জলের ন্যায় জলের স্বাদও শীত গ্রীষ্মে একই রকম থাকিত না। তাঁহারা গ্রীষ্মকালে কর্পোরেশনের প্রতি গালাগালি বর্ষণ না করিয়াই সুরসাল সুমধুর অমৃতফলে রসনাকে সরসে রসিকা করিয়া এবং স্বচ্ছন্দ সুশীতল কূপোদক পানে দেহ সুশীতল করিয়া সংবাদ পত্রে ও পৃষ্ঠায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন।

ডাকঘর

আষাঢ় মাসে, ২৮শে জুন গোকুলচন্দ্র নাগের জন্মতিথি। গোকুল কল্লোলের প্রাণস্বরূপ ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার খ্যাতি লাভ ঘটিয়াছিল। গোকুলচন্দ্র প্রায় দশ মাস কাল হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত দেখিতে গোকুলের একান্ত বাসনা ছিল। সেই কারণেই গোকুল বাঙলা ভাষার প্রতি এত শ্রদ্ধাবান ছিল এবং তাহার সুযোগ ও সময়ানুসারে সে বাঙলা ভাষার সাধনা ও সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার মনের সেই বিকাশের অবস্থায় একস্থানে যাহা লিখিয়াছিল তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি! এই কয়টি অল্প কথায় তাহার মনের ঐ জাগ্রত অবস্থাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বোধ হয় প্রত্যেক বাঙলার তরুণের জীবনের পথে এই কথা কয়টি মনে করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে।

"মানুষের কামনাকে জাগিয়ে তোলে তৃষ্ণা, মানুষকে কাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় কামনা, মানুষকে নির্ম্মল করে বেদনা, মানুষকে সুন্দর করে প্রেম।"

গোকুলকে যদি কেবল মাত্র বন্ধুভাবে ভালবাসিতাম, তাহা হইলে হয় ত তাহার কথা এমন করিয়া আলোচনা করিতাম না। গোকুল আমার বন্ধু ছিল কিনা সে জানিত, কিন্তু আমি তাহাকে বন্ধু বলিয়াই বিশ্বাস করিতাম। সে বন্ধুত্ব আমার একান্ত নিজস্ব, সকলকে তাহার বিষয় বলিতাম না। কিন্তু গোকুল কল্লোলের প্রতিষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে ভাবে সেবা করিয়াছে তাহা কল্লোলের সকলের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। আমার পক্ষেও তাহা মনের আড়াল করিবার উপায় নাই। এই কল্লোলের ভিতর দিয়াই বাঙলার পাঠক সমাজের সঙ্গে তার শেষ কালের পরিচয়। পূর্ব্বেও সে লেখক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিল। এই কারণেই তাহাকে সাধারণের পক্ষ হইতে স্মরণ করিতেছি।

তাহার বহুগুণ ছিল এবং সে সকল গুণ সকল মানুষেরই থাকা উচিত। আমাদের মনে যে আদর্শ-মানুষের ছবি আঁকা থাকে, তাহার কোনও একটী অংশের সহিত কোনও মানুষের কিছু মিল দেখিলেই সেই মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহাকে ভালবাসি। গোকুলকেও হয় ত সেই কারণে ভালবাসিতাম এবং অন্য অনেকেও ভাল বাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন।

তাহার দায়িত্বজ্ঞান আমাদের অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। এ বিষয়টিতে তাহার এতখানি নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই প্রথম হইতেই কল্লোল চালাইবার অনেক সুবিধা পাইয়াছি। যে কোনও বিষয়ে তাহার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইত।

এমন দিনও গিয়াছে যে কল্লোলের কাজ সারিয়া রাত্রি নয়টা দশটার সময় কলিকাতার অপর প্রান্তে তাহার বাসস্থানে হাঁটিয়া পাড়ি দিতে হইয়াছে। এবং পরের দিন অতি প্রত্যুষে ছাপাখানায় আসা দরকার বলিয়া রাত্রি থাকিতেই

হয়ত হাঁটিতে সুরু করিয়া সে যথাসময়ে কাজে আসিয়া যোগ দিয়াছে। এই কারণে আমারও কাজ করিতে সুবিধা হইত। আমার মনের সঙ্গে তাহার মনের এইখানে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাহার কাজটুকু সে নিশ্চয়ই করিবে বিশ্বাস করিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজ শেষ করিয়া লইতে পারিতাম।

কল্লোল যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন হইতেই সে 'পথিক' উপন্যাস লেখা আরম্ভ করে। প্রত্যেক মাসেই তাহাকে উপন্যাসের অংশ লিখিয়া দিতে হইত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোগে, দুঃখে, অভাবে বা অন্য কোনও কারণেই তাহাকে লেখা দিতে দেরী করিতে দেখি নাই। কখনও লেখার জন্য ত তাগিদ করিতেই হয় নাই বরং অনেক সময় নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই তাহার লেখা পাইয়াছি। সব প্রতিশ্রুত লেখা, যাহা অন্যের নিকট হইতে পাইতে হয়, তাহা যদি যথা সময়ে পাওয়া যায় তাহা হইলে লেখা সাজাইতে ও বাছিতে অনেক সুবিধা হয়। ছাপাখানার পক্ষে এবং ঠিক সময়ে কাগজ বাহির করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও অসুবিধা হয় না।

গোকুল যত দিন 'পথিক' লিখিয়াছে, তাহার লেখার জন্য কোন দিন কোনও অসুবিধাতে পড়িতে হয় নাই। অথচ পথিক প্রত্যেক সংখ্যায় অনেকখানি করিয়া ছাপা হইত এবং দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল সে ঐ অতখানি করিয়া লেখা স্বচ্ছন্দে যোগান্ দিয়াছে।

সে আর আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই কিন্তু যে পরিচয়-সূত্রে সে আমাদের বন্ধুত্বের অধিকার দিয়াছে তাহার বলে আমরা তাহার জন্ম দিনে আমাদের প্রীতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছি।

———

প্রবাসী ও মডারন্ রিভিউ পত্রের সম্পাদক, বাঙলা মাসিকপত্র-সৌকুমার্য্যের পথ প্রদর্শক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লীগ্ অব্ নেশান্স অর্থাৎ মহাজাতি সংঘের সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জেনেভায় যাইতেছেন। আগামী ১লা আগষ্ট বোম্বাই হইতে তাঁহার ইউরোপ যাত্রা করিবার কথা। এবার বাঙলার তিনটি মনীষি বিদেশে একত্রিত হইবেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই ঐ দেশে রহিয়াছেন। লীগ্ অব্ নেশান্স-এর মত অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি ও তাহার মতকে তুচ্ছ মনে করেন না, তাঁহাদের নিমন্ত্রণে তাহা বুঝিতে দিয়াছেন। বাঙালীর পক্ষে এই সম্মান গৌরব ও আনন্দের বিষয়।

রামানন্দবাবু লীগ্ সম্বন্ধে সকল প্রকার তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে চেষ্টা করিবেন। লীগের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধিকার, শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা, শ্রমিকদের এবং ভারতের নানা স্থানের স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, রামানন্দ বাবু তাহা জানিতে চেষ্টা করিবেন। নারী ঘটিত অন্তর্জাতি পাপ ব্যবসা দমন লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কি উপকার হইতে পারে তাহাও তিনি জানিবেন। ইহা ভিন্ন চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্য আহরণ করিবারও তাঁহার ইচ্ছা আছে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতের প্রতিনিধিবর্গের এই শুভযাত্রায় সুফল কামনা করি।

———

গতবারে দুইটি সমিতি স্থাপনের বিষয় সংবাদ দিয়াছি। একটি দিল্লীতে—দিল্লী হইতে বন্ধুরা জানাইয়াছেন তাঁহাদের সমিতির নাম বেঙ্গলী ক্লাব।

ঢাকার প্রগতি-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের হাতের লেখা প্রগতি পত্রিকাও আমরা পাইয়াছি। তাহাতে এমন অনেক লেখা দেখিলাম, যাহাতে আশা হয় ঐ সকল লেখক ও লেখিকারা এক সময়ে রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।

সংবাদ পাইলাম পল্লী কবি জসীম উদ্দিন ও তাঁহার বন্ধুগণ মিলিয়া ফরিদপুরে একটি সাহিত্য সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারাও সেখানে পাঠ ও লেখা চর্চ্চা করিবেন। সমিতির নাম দিয়াছেন 'কল্লোল সংঘ';—

আমরা তাঁহাদের অনুরোধ করিয়া জানাইয়াছি তাঁহারা

যেন কল্লোলের নামে ঐ সমিতির নাম না রাখেন! কারণ তাহাতে হয় ত সকলের পক্ষে ঐ সমিতিতে যোগ দেওয়া সুবিধা হইবে না। সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত মতের ঐক্য থাকিলেও কল্লোল বা ঐরূপ কোনও বিশেষ নামে পরিচিত হওয়ার দরুণ কাহারও কাহারও ঐ সমিতিতে যোগ দান করিবার বাধাও হইতে পারে।

তরুণ প্রাণের ও শরীরের স্বাস্থ্য উন্নতিলাভ করিবে আশা করিয়া আমরা এই সমিতিকে অভিবাদন জানাইতেছি।

এই সমিতির যাঁহারা উদ্যোক্তা ও সেবক তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করুক।

সংবাদ পাইয়াছি কল্লোলের লেখক যাহার ও তাঁহার বন্ধুরাও চট্টগ্রামে নিজেদের উন্নতি কল্পে ঐরূপ একটি কল্লোল সংঘ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদেরও ঐ নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছি।

মনে হইতেছিল, এই সমিতিগুলির ভিতর একটি পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। সেই কারণে আমরা প্রস্তাব করি, কোনও সমিতির সভ্য বা কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি অন্য সমিতির সহিত পরিচয় ও যোগরক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে আমাদের পত্রদ্বারা জানাইতে পারেন। আমরা প্রথম অবস্থায় সমিতিগুলির ঠিকানা ও সম্পাদক বা তদ্রূপ বন্ধুদের নাম সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিতে পারি। মনে হয়, এই ভাবে চোখে দেখা না হইলেও অধ্যাত্মভাবে বহু জনের মনন ও কার্য্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হইবে। এবং পরস্পরের মতামত ও কার্য্যপ্রণালীর সংবাদ জানিয়া সমিতিগুলির পরিচালন সম্বন্ধেও সুবিধা হইতে পারে।

এই সকল সমিতিগুলিতে কেবল মাত্র সাহিত্যেরই চর্চ্চা হইবে, কি দেশের বা স্থানীয় অন্য কোনও বিষয়েরও সম্বন্ধ থাকিবে তাহা সমিতির উদ্যোক্তাগণ স্থির করিবেন।

মনে হইতেছিল, সাহিত্য চর্চ্চা বা সাহিত্য সেবা করিতে হইলে অন্ততঃ নিজেদের দেশের বা বাসস্থানের সকল প্রকার অবস্থার সহিতই যোগ থাকা দরকার। সাহিত্য কেবল মাত্র নিছক কল্পনা নয়। দেশের অশ্রু প্রবাহ, দুঃখের দহন, আনন্দের জ্যোতি, শৌর্য্যের গৌরব এ সকলই সাহিত্যের ইতিহাস গাঁথিয়া দেয়। দেশ যে সুরে জাগে, কথা কয় সাহিত্যও সেই সুরে রচিত হইতে থাকে। কবির ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দিব্য দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু বর্ত্তমানকে, বিশেষ দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে অবহেলা করিয়া কোনও সাহিত্যই দেশের সাহিত্য হইবে কি না সন্দেহ।

সাহিত্যের নামে নিজের প্রতি ও অন্য সকলের প্রতি যে একটা উদাসীনতা তরুণ মনে জাঁকিয়া বসে তাহাতে তরুণদেরগুলিকে বড় আশাহীন ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলে বলিয়া মনে হয়। অনেক স্থলে কর্ত্তব্য কাতর, এমন কি বিশৃঙ্খল স্বভাবও করিয়া ফেলে।

সাহিত্যের সেবা করিতেও মনের ও শরীরের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের দরকার। মাটীকে খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়া লাভ নাই। মাটী খুঁড়িয়া কোহিনুর তুলিবার পণ করা আবশ্যক।

তরুণের দলকে দেখিয়া, তরুণের লেখা পড়িয়া, তরুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া যেন মানুষের মন আশায় আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

দুঃখ ও জীবনের সমস্ত বাধাকে হটাইয়া দিয়া তরুণ যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পথ কাটিয়া চলিয়াছে ইহাই যেন তরুণের জয়যাত্রার পরিচয় হয়।

সমস্ত তরুণদলের সহিত আমাদের মনকেও মিলাইয়া দিতেছি। আমাদের পতাকা যেন আমাদের বোঝা না হয়।

বর্ত্তমান সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত স্বর্গগত সুকুমার ভাদুড়ীর পরিবার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

সুকুমার অতি অল্প বয়সেই বাঙলার পাঠক সমাজে তাহার রচনার ভিতর দিয়া পরিচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, কল্লোল, বাঁশরী, নবযুগ, মাসিক বসুমতী, মোশলেম্ ভারত, নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, মহিলা, ভারতী, বিজলী, প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতে, গল্প কবিতা ও প্রবন্ধের আকারে তাহার অনেক লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। এই কারণে পাঠক সমাজ তাহাকে চিনিয়াছেন।

সুকুমার অল্প বয়স হইতেই বহু কষ্ট করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছিল। পরে একটি ভগ্নীর বিবাহ দিবার জন্য কতকগুলি টাকা ঋণ করিয়াছিল। সেই ভগ্নীর বিবাহ হইবার পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। ঋণগুলি এখনও পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। অথচ এই ঋণের জন্য সুকুমারদের পৈতৃক বাড়ীখানা হস্তান্তর হইয়া যাইতে বসিয়াছে। তাহার বিধবা মাতা ও একটি ছোট ভগ্নী এই কারণে অত্যন্ত বিপন্না। বাঙলার পাঠক সমাজের নিকট আমাদের বিশেষ নিবেদন, যদি কাহারও মনে হয়, এই তরুণ সাহিত্য-শিষ্যের পরিবারকে সাহায্য করিতে পারিবেন তাহা হইলে তাঁহারা যা কিছু দান করিবেন আমরা সুকুমারের বিদেহী আত্মার নামে একান্ত কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করিব। যঁাহার যাহা দেয়, তিনি কল্লোলের সম্পাদকের নামে পাঠাইলেই তাহা আমরা সুকুমারের জননীর নিকট আমাদের ভিক্ষার সঞ্চয় পৌছাইয়া দিব। সামান্য দানও উপকার আসিবে মনে করিয়া যাঁহার যাহা দিতে ইচ্ছা করিবে তাহাই দিবেন।

বাঙলার তরুণদল আজ একটু চেষ্টা করিলেই একটি তরুণের বিপন্ন পরিবারকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পাবেন।

সুকুমারের পরিবারের সম্মান রক্ষা কবিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমরা এই দাবী করিলাম। ভরসা করিয়া রহিলাম দেবতার কৃপায় ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইবে।

———

অনেক গল্প ও কবিতা পড়িয়া মনে হয় যেন এ গুলির মধ্যে কোনও নূতনত্ব নাই।

অধিকাংশ রচনা গুলিতেই আছে একটি মানসী নারীর প্রতি আকুল আহ্বান! তাই মনে হয় নূতনত্ব কিছু নাই! যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ নারীর স্নেহে ও প্রেমে বর্দ্ধিত হইয়াও একটি অদৃশ্য নারীকে সংসারের নিত্যকারের ধূলিধূসর মরুর অপর প্রান্তের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া ফিরিয়াছে। ডাকিয়া বলিয়াছে, হে অভিসারিকা, আমি তোমার জন্য দিনের কাজে চকিত হইয়া থাকি, রাত্রি জাগিয়া তোমার পদধ্বনি শুনিবার জন্য বসিয়া থাকি। আমাকে রিক্ত করিয়া পরিত্রাণ কর, আমাকে শূন্য করিয়া মুক্ত কর। দুঃখ ও সুখে তোমার অরূপ পূর্ণ আবির্ভাব আমার জীবনকে মরণের মৃত্যু পারে পৌছাইয়া দিবে। এই সব-হারাবার জয়মাল্য কণ্ঠে দুলাইয়া আবার নবজন্মের পথে যাত্রা করিব। আমি সে দিন এ নিখিলে অম্লান নূতন হইয়া আসিয়া অবতীর্ণ হইব। সেই যে নূতন আমি, আমার ললাট চুম্বন করিয়া তুমি এক ক্ষয়হীন জন্মদিনের জাগরণ আনিয়া দিবে। দুঃখের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সূর্য্যের মত অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়ের মত এ ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে দেখা দিব। তোমাকে সেদিন আমার চিরবিস্ময়ের অন্ধকার যবনিকার অন্তরাল হইতে আমার জীবনের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। আমি আর তখন একলা থাকিব না। তোমাকে যাহারা খুঁজিয়া ফিরিবে তাহাদের ডাকিয়া বলিব, সেই মায়াবতী নারী আমার সর্ব্বময়ী হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে ছুঁইবার আশা লইয়া কল্পনার গহনবনে ফিরিয়া মরিও না।

এই কথা গুলি বুঝিবার জন্যই বুঝি তরুণ ও প্রাচীন নিত্য নূতন করিয়া নানাভাবে, নানা ঘটনার সহায়তা লইয়া ঐ মানসীকে দেখিতে চাহিতেছে। দক্ষিণ হস্তে শূন্য পাত্র লইয়া তাহার এই সুধার সন্ধানে যাত্রা। অকস্মাৎ পুরুষের চিত্ত আত্ম-হারা হইয়া ওঠে। চির যৌবনা ঐ স্বপ্ন সঙ্গিনীকে স্পর্শ করিবার তৃষ্ণায় মানুষ ধরিত্রীর সকল দুয়ারে আঘাত করিয়া ফেরে। সেই আঘাত যখন তাহারই বক্ষে ফিরিয়া আসে তখনই চির-তৃষিত মানব হাহাকার করিয়া ওঠে। তাহার প্রেম তাহাকে নিরাশ করে। যে প্রেম মানুষকে নির্ম্মল করিয়া চিরজীবনের সম্পদ হাতে তুলিয়া দেয় সে প্রেম তাহাকে দেখা দেয় না!

তাই বুঝি মানুষের এই অনন্ত কালের আক্ষেপ, বাসনার সাগর মন্থন করিয়া অমৃতের অভিলাষ।

———

কল্লোল

শিল্পী—সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

Mohila Press, Cal

চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল-পাবলিশিং হাউস্‌

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

কল্লোল

আশ্বিন, ১৩৩৩

রাখালী

জসীম উদ্দীন

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রান্‌তে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান্‌ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোন মতেই থাম্‌তে নারে।
এই মেয়েটি এম্‌নি ছিল যাহার সাথেই হ'ত দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, বড়ুরে তুই মিছি মিছি হাসিস বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়!
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার না সে আবীর,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙীন রবির!
কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁট্‌টি তাহার,
মাঠে-ফোটা কলমি ফুলে কতকটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল, ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে
দু একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখ্‌ছে ধ'রে।*

সাঁঝ সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফির্‌ত যখন হেসে খেলে !
মনে হ'তে ঢেউয়ের জলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে !

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চল্‌তে ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কল্‌সীটিরে।
দোষ কি তাহার ? ওই মেয়েটি মিছি মিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল ! অমন রূপে কেম্‌নে রাখে পরাণটা সে ?
এ পথ দিয়ে চল্‌তে তাহার কোচের হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে।
মাঠের ছেলের 'নাস্তা' নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রান্‌ছে যেথায় ?
'নীড়ের' ক্ষেতে বারে বারে তেস্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি
ভর্‌-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ী।
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটীর বাঁশীটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা !
এমনি করে দিনে দিনে লোকলোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়্‌ল বাঁধা দুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চল্‌ত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগ্‌ত ভারি ওদের বাটে

মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস
ওই মেয়েটির জল-ভরনে ভাস্‌ত ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বল্‌ত যেন মনে মনে
“জল ভর লো সোনার মেয়ে, হবে আমার বিয়ের ক’নে ?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব গাঁয়ের বালা ;
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের
সোনালতায় গড়্‌ব বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটীরখানি
মেঝে্‌য় তাহার ছড়িয়ে দেব শরষে ফুলের পাপড়ি আনি’
কাজলতলার হাটে গিয়ে আন্‌ব কিনে পাটের শাড়ী।
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ী ?”
এই রূপেতে কত কথাই আস্‌ত তাহার ছোট্ট মনে,
ওই মেয়েটি কলসী ভ’রে ফির্‌ত ঘরে ততক্ষণে।
রূপের ভার আর বইতে নারে কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে
কোনোরূপে চল্‌ছে ধীরি মাটীর ঘড়া জড়িয়ে ধ’রে।
রাখাল ভাবে কলসখানি না থাক্‌লে তার সরু কাঁখে
রূপের ভারেই হয় ত বালা পড়্‌ত ভেঙে পথের বাঁকে।
গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে
কলস ঘিরি উঠ্‌ছে দুলি’ গেঁয়ো বালার রূপের টানে।
মনে মনে রাখাল ভাবে গাঁয়ের মেয়ে সোনার মেয়ে
তোমার কালো কেশের মত রাতের আঁধার এল ছেয়ে।
তুমি যদি বল আমায় এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি
কলাপাতার আঁধার-ঘেরা ওই যে ছোট তোমার বাড়ী।
রাঙা দু’খান্‌ পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে
পথের কাঁটা কত কিছু ফুট্‌তে পারে কোন মতে।
এই যে বাতাস—উতল বাতাস উড়িয়ে নিল বুকের বসন
কতখন আর রূপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন !

যদিই তোমার পায়ের খাড়ু যায় বা খুলে পথের মাঝে
অমন রূপের মোহন গানে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে !
আহা আহা সোনার মেয়ে একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হ'ত রাঙা
কখন্ হলুদ আধ-হলুদ আধ-আবীর মেঘে ভাঙা !
তার পরেতে আস্‌ত আঁধার ধানের ক্ষেতে বনের বুকে
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফির্‌ত রাখাল ঘরের মুখে

সেদিন রাখাল শুন্‌ল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে
আস্‌বে কালি 'নওসা' তাহার ফুল-পাগ্‌ড়ী উড়িয়ে দিয়ে।
আজকে তাহার 'হল্‌দি কোটা' বিয়ের গানে ভরা বাড়ী
মেয়ে-গলার করুণ গানে কে দেয় তাহার পরাণ ফাড়ি'।
সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি কর্‌ছিল সান্
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা'খান্
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুকভেঙে যায়,
আহা ! আহা ! হলুদ-মেয়ে কেমন ক'রে ভুল্‌লে আমায় ?
সারা বাড়ী খুশীর তুফান কেউ ভাবে না তাহার লাগি'
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মোকদ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এল আপন ঘরে
সারাটা রাত মর্‌ল ঝুরে কি ব্যথা সে চক্ষে ধরে !

বিয়ের ক'নে চল্‌ছে আজি শ্বশুর-বাড়ী পাল্‌কি চ'ড়ে
চলছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধ'রে।

সারাটাদিন বিয়ে বাড়ী ছিল যত কল-কোলাহল
গাঁয়ের পথে মূর্ত্তি ধ'রে তারাই যেন চল্‌ছে সকল।
কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়াল আজ কেমন কেমন,
ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছে নি ভাই তেমন তেমন ?
মেয়ে-জামাই মিল্‌ছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা
সূর্য্য যেমন বইছে পাটে ফাগছড়ান স'াঝের বেলা।
এমনি ক'রে কত কথাই কত জনের মনে আসে
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে !
হায় রে আজি এই আনন্দ যারে লয়ে এই যে হাসি
দেখ্‌ল না কেউ সেই মেয়েটির চোখ ছুটি যায় ব্যথায় ভাসি।
খুঁজ্‌ল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি
বিজন রাতের প্রহর থাকে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি।
সেই মেয়েটির চলা-পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে
একলা রাখাল বাজায় বাঁশী ব্যথায় ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটীর সুরে বাঁশী তাহার ফেরে উদাস
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস ;
করুণ করুণ—অতি করুণ বুকখানি তার উথল করে,
চলে বাঁশী ধারি ধারি ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

"কোথায় জাগো বিরহিনী আজ বিরল কুটীরখানি,
বাঁশীর ভরে এস এস ব্যথায় ব্যথায় পরাণ হানি।
শোন শোন দশা আমার গহন রাতের গলা ধরি'
তোমার তরে ও নিদয়া, একা একা কেঁদে মরি।

এই যে জমাট রাতের আঁধার আমার বাঁশী কাটি' তারে
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কেঁদে মরে বারে বারে।"

ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে,
আঁধার দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাওয়ায় দোলায় ব্যথার ভারে।
তাহার ব্যথা কে শুনিবে ? এই দুনিয়ার মানুষ যত
তাহার মত, ছেলেবেলার থাকৃতে পারে বুকের ক্ষত।
তাদের ব্যথার একটু পরশ যদিই বাঁশী আন্‌তে পারে
(তারা) রাখালীরও উদাস সুরে গায় যেন গো তাইরে নারে।

কবির বিয়ে

গোকুলচন্দ্র নাগ

কি মুস্কিলেই পড়েছি! আজ প্রায় তিন বছর হ'তে চল্‌ল চাকরি নিয়ে বিদেশে এসেছি, কিন্তু বাড়ী ফির্‌বার কোন কিনারা করে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। সিভিল সার্‌ভিস-এর আইন অনুসারে প্রত্যেক কেরানীর বছরে এক মাস ছুটী বরাদ্দ; কিন্তু কেন যে আমার কপালে এই তিন বছরে তিন দিনও ছুটী জুট্‌ল না তাই ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। সাহেবকে যদি বলি, বাড়ী যাব, ছুটী দাও। অম্‌নি ব্যাটা মুখটাকে যতখানি পারে গম্ভীর করে গাল গলা ফুলিয়ে মাথাটাকে নেড়ে বলে ওঠে, You sec Mr. Ray . . . । তারপর মিনিট খানেক আর কোন সাড়া শব্দ নেই! ঐ ফাঁকে যদি চলে আসি তাহ'লে গোল মিটে যায়, যদি না আসি তাহ'লে গোল বেঁধে যায়। সে দিন সাহেব আমায় বেশ ক'য়ে বুঝিয়ে দিল, বাঙালীদের responsibility-জ্ঞান কিছুই নেই। আমি বল্‌লাম, কিসে টের পেলে সাহেব? সাহেব পুঙ্গব হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌লে, নিশ্চয়ই নাই, তার একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত এই তুমি—ব'লে চম্পক কদলীসদৃশ আঙ্গুলটী আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

বাপ্‌রে, এত বড় একটা অন্যায় হয়ে গেছে আর তার নায়ক হচ্ছি আমি! প্রায় কেঁদে ফেলেই বল্‌লাম, সাহেব, বাঙালীর মুখে চুণকালি যে দিয়েছি তোমার কথায় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু কি করে যে দিলাম সেটাই কেবল . . .। সাহেব বললেন, শুধু তুমি বলে নয়, সবাই সবায়ের মুখে চুণকালি দিয়েছে। যাক্ একটু হাঁপ ছেড়ে বাচ্‌লাম। আমারও দোসর আছে।

সাহেব বক্তৃতা শুরু কর্‌লেন, এই মহাসমরে লক্ষ লক্ষ লোক দেশের জন্যে জীবন দান করছে। তাদের অনাথ পরিবারের একটা জীবিকার হিসাবের ভার তোমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। এত বড় দায়িত্ব অবহেলা করে তোমরা চাও নিজেদের স্বার্থের সিদ্ধি! তোমার নিজের হাতেই তিন হাজার ছ'শো পঁয়তাল্লিশ জন অনাথ স্ত্রীলোকের পেনসন-এর হিসাব রয়েছে, তা ভুলে গিয়ে তুমি . . .।

এবার আমার মাথায় দুষ্টু সরস্বতী চেপে বসল। ধাঁ করে বলে ফেললাম, আজ্ঞে তিন হাজার ছ'শো ছেচল্লিশ। সাহেব গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন, তোমার ভুল, পঁয়তাল্লিশ। আমি বল্‌লাম—আজ্ঞে না হুজুর। তিনি বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, আমি নিজে তোমায় দিয়েছি তিন হাজার ছ'শো পঁয়তাল্লিশ। আনো রেকর্ড। আমি হাত জোড় করে বল্‌লাম, অপর একটী অনাথাকে আমি নিজে জোগাড় করে নিয়েছি। সাহেব বুঝ্‌তে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, কে শুনি? আমি মাথাটাকে একটু চুলকে বল্‌লাম, আজ্ঞে সেটী আমার স্ত্রী।

বেশ বুঝ্‌তে পারলাম, সাহেব যতই হাসি চাপবার চেষ্টা করছে ততই লাল হয়ে উঠ্‌ছে আর চোখের কোণ

ছোট হ'য়ে আসছে। বুঝলাম এটি সুলক্ষণ। বললাম, সাহেব, দায়িত্বজ্ঞানটা কি শুধুই ঐ সৈন্যদের মাইনের হিসাবে খাতায় বেঁধে রাখতে হ'বে? সাহেব বললেন, তা জানি, কিন্তু উপায় কি? আমি বললাম, উপায় করতেই হ'বে। আচ্ছা সাহেব, তোমার মেম সাহেবের জন্যে কি একটুও দায়িত্ব আর বাকি রাখ নি, সবটাই কি এই হিসাবের খাতায় খরচ করে ফেলেছ?

এত কালের পরে বুঝি ওষুধ ধরল! কে জানত মেম সাহেবের নামে বেটা অজ্ঞান হয়ে যায়, তা হ'লে দিনে ছশো বার ঐ নাম গান করতাম্। অত বড় জাঁদরেলী বপুখানি কি করে যে রিভলভিং চেয়ারের ভিতর প্রায় তিন ভাগ ঢুকে গেল তা বুঝে উঠতেই পারলাম না। দুটো আঙুল কপালের উপর টিপে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, Mr. Ray, আমিও মানুষ।

আমি তার কাছে সরে এসে সহানুভূতি জানিয়ে বললাম, তুমিও কেন ছুটী নাও না সাহেব? সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, সে হয় না। আমি বললাম, আর আমার? সাহেব বললেন, তুমি গেলে আমার চলবে না। আমি বললাম, কিন্তু চলতেই হবে। সাহেব বিরক্ত হ'য়ে বললেন, আমি না দিলে তুমি ছুটী পাবে কোথায়?

আমি বললাম, ক'রে নেবো সাহেব। দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমার কাছে একখানা telegram আসবে—আমি মরে গেছি আমার স্বামীকে পাঠাও। মিসেস্ রায়।

এবার গাম্ভীর্য্যের বাঁধন ছিঁড়ে গিয়ে সাহেবের দেহ-নৌকাখানি হাসির ঢেউয়ের ধাক্কায় টেবিল হ'তে চেয়ার, চেয়ার হ'তে টেবিলে কাত হ'য়ে হ'য়ে পড়তে লাগল। হাসির বেগ থামলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার office-এ তোমার মত আর একটী জোটে নি। আচ্ছা ছুটী মঞ্জুর—কিন্তু ছুটী ফুরিয়ে গেলে যে ডাক্তারের চিঠি পাঠাবে পেটে ব্যথা হয়েছে, তা হবে না। আমি জিভ কেটে বললাম, তাও কি হয়। মনে মনে বললাম, তিন মাস কড়ায় গণ্ডায়!

সাহেবের কামরা থেকে আমার টেবিলে এসে দেখি—একখানা সোনালী মাখান লাল খাম, উপরে বাঁ দিকের কোণে বড় বড় রূপালী অক্ষরে লেখা "শুভ বিবাহ"।

ভগবান যখন প্রসন্ন হন তখন বুঝি এমনিই হয়। বাংলা দেশ থেকে ১৪০০ মাইল দূরে এই পুনা পাহাড়ের ওপর আমাকে মনে করে কেউ শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছে দেখে মন আনন্দে ভ'রে গেল। চিঠি খুলে দেখি 'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং' থেকে আরম্ভ ক'রে 'ত্রুটি মার্জ্জনা' পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী অক্ষর আমাকে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করছে। কিন্তু এমনই মুস্কিল যে কিছুতেই পাত্রটীকে চিনে উঠতে পারছি না। 'শ্রীমান সতীশচন্দ্র সিংহ বাবাজীবনের সহিত কুমারী নির্ম্মলার শুভ বিবাহ উপলক্ষে . . .'। শ্রীমান সতীশচন্দ্র সিংহ?

আমার নোট-বুকে আমার যে সমস্ত বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল তাই দেখতে বসে গেলাম। এই ত সতীশচন্দ্র সিংহ আমাদের কবি সতু! কি ভয়ানক অন্যায়, ওর কথা আমার একবারও মনে হয় নি। আর আমারই বা দোষ কি, সে ত প্রতিজ্ঞাই করেছিল, কখনও বিয়ে করবে না। আজ তার বিয়ের চিঠি পেয়ে যেমন আনন্দ পেলাম তেমনি আশ্চর্য্যও হ'লাম। আমরা সকলেই একবয়সী। আমাদের ওসব ঝঞ্ঝাট কত পূর্ব্বে শেষ হয়ে গেছে। তা ব'লে কেউ যেন না মনে করেন সতীশ পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, আর তা হ'লেই বা কি? সে কবি, তার পঁচিশও যা পঁয়ষট্টিও তাই।

সাহেবকে লম্বা সেলাম ঠুকে কলকাতার গাড়ীতে চ'ড়ে বসলাম। কিন্তু এই তিন দিন যে গাড়ীতে বসে থাকতে হবে তাইতেই যে অস্থির হ'য়ে উঠলাম। এই একুশে তারিখটার কান মোলে তেইশে করে দিতে পারলে কোন গোল থাকে না, কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠল না। সময়টা আমারই কান মোলে তার স্থিতিটা বেশ করেই জানিয়ে দিয়ে গেল।

বাড়ীতে এসে ছোট ভাই-বোনদের একটা ঝুড়ি দেখিয়ে বললাম, ঐটা দালানে নিয়ে খুলগে যা, ভিতরে প্রত্যেকের নাম লেখা কিছু কিছু জিনিষ দেখতে পাবি। তারা মহা কলরব করতে করতে চলে গেল।

ঘরে এসে জামা ছাড়ছি, এমন সময় একটী নীলাম্বরী সাড়ীর পুঁট্‌লী সাদা ধপ্‌ধপে দুটী হাত বার করে আমার পায়ের ধূলা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই কি রমা? কি ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে ও!

বেদনায় বুক টন্‌টন্ করে উঠ্‌লেও ঠোঁটের কোণে হাসি এনে একটু পরিহাস করে বল্‌লাম, দিব্যি গতরটী করেছ যে। কাপড়ের পুঁটলীর থেকে একটী মুখ বেরিয়ে এল, ঠিক যেন মেঘের আড়াল থেকে পূর্ণচন্দ্র দেখা গেল! সে বল্‌ল, আচ্ছা গো আচ্ছা, একবার নিজের চেহারাটী আয়নাতে দেখ, তার পর আমায় বল্‌তে এস। মাগো, এমন করে নিজের শরীরে অযত্ন করতে হয়, ব'লে সে আমায় চেয়ারে বসিয়ে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিতে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লাম, ওগো অযত্ন হবে কেন, তোমার সতীন খুব যত্ন ক'রেই আমায় চোখে চোখে রেখেছিল, তারই অতি যত্নে একটু অজীর্ণ হ'য়েছে আর কি! সে হে'সে বল্‌ল, আমার আবার সতীন কে শুনি? আমি বল্‌লাম, বড় সাহেব। তার মাথাটী আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল। হাসি আর কান্নায় তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌ছিল। আমার চোখ দুটীতে কেন যে মিছি মিছি জল ভ'রে উঠ্‌ল তা জানি না। তার মুখখানি আমার মুখের কাছে তুলে ধ'রে . . . । ছি ছি, নিজের কথাই পাঁচ কাহন কয়ে যাচ্ছি। আমি কবির বিয়ের গল্প করতে ব'সে আরম্ভ করলাম, কবিত্বহীন আটপৌরে গদ্য জীবনের কথা বল্‌তে। আমার এই ছাব্বিশ বছর বয়সেই যে এত ভুল হ'তে আরম্ভ হয়েছে তা জান্‌তাম না।

বিকালে যখন সতীশদের বাড়ীতে এলাম তখন তিনি বাইরের ঘরে একটা সোফায় বসে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিলেন। ভাবনাটা এতই গাঢ় যে আমাকে মোটেই লক্ষ্য করলেন না। কবি আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছিলেন তা আমার মত অকবির জান্‌তে চাওয়াই ধৃষ্টতা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুলিস-দারোগার মত বেশ মোলায়েম করেই বললাম, ভিতরে কি আস্‌তে পারি মশায়?

ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় কবি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, জ্রূদুটী বাঁকিয়ে তিনি বল্‌লেন, কে মশায়? আমি বললাম, কবি, অতি অকিঞ্চিৎকর এই আমি মাত্র। কবি যে রকম ক'রে লম্ফ প্রদান ক'রে আমার কাছে এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন তেমন ক'রে কোন কবি কাকেও বুকে ধরেছিলেন কিনা জানি না, তবে ডাক্‌-ঠাকুরকে একজন ঐ রকম ক'রে ধরেছিলেন তা জানি।

কবি আমায় সোফায় বসিয়ে বল্‌লেন, সত্যি বলছি রমেশ, তুই যে আস্‌তে পারবি তা স্বপ্নেও ভাবি নি! বড় আনন্দ হ'চ্ছে আমার। এ আনন্দে আমার সারা দেহ গান গেয়ে উঠ্‌ছে। তোর সঙ্গে মিলনে যে একটা...। আমি বললাম, ঐ খানে ভুল করলে ভাই, আমার সঙ্গে মিলনের জন্যে ঠিক এতটা সুখ পাও নি হয় ত, ভিতরে আর একটা কিছু আছে। উপস্থিত শুধু তোমার রমেশই আসেন নি, রমাটীও সঙ্গে এসেছেন। তোমার কবিত্বটা একটু বন্ধ রেখে তাকে বাড়ীর ভিতর পাঠাবার উপায় করে দাও।

সোফায় দুজনে মুখোমুখি ব'সে শারীরিক কুশল ইত্যাদি প্রশ্নের পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কবি, তার পর? কবি বললেন, তার পর আর কি ভাই, যা দেখছ এই। আমি বললাম, উঁহু, ঠিক তা নয়, আরো কিছু বাকি আছে। কবি বিস্তর ওজর বা ন্যাকামির অভিনয় ক'রে শেষে বল্‌তে আরম্ভ করলেন—

আমার কবিতাগুলো যত সম্পাদকের কাছে পাঠাই সকলেই ফিরিয়ে দেয়—কেউ বলেন স্থানাভাব, কেউ বলেন ভাল হয় নি ইত্যাদি। বড় খারাপ লাগ্‌ল। দিন কতক ভেবে এক মতলব আঁট্‌লাম। আমার কতকগুলো বাছাই করা প্রেমের কবিতা নির্ঝরিণী কাগজে মেয়েমানুষের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। নাম নিয়েছিলাম অরুণা দেবী।

বলিস্ কিরে রাস্কেল, বাটপাড়, আঁ! এত বড় মদ্দটা একেবারে বেমালুম অরুণা দেবী বলে চালিয়ে দিলি! দিনের বেলায় হাজার লোকের চোখের সামনে!

আরে আগে শোন্ সবটা, তারপর গালাগালি দিস্। নির্ঝরিণীর সম্পাদক আমায় এক লম্বা চিঠি পাঠালেন, অরুণালোকপাতে নির্ঝরিণী ঝকমকিয়ে উঠেছে। আমার কবিতা এত হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠক-সমাজকে এত দিন ওর

রস থেকে বঞ্চিত ক'রে—তাদের প্রতি বড়ই অবিচার করেছি ইত্যাদি। তার পর—

তারপর, রাস্তার man hole খুলে দিলে যেমন বদ্ধ জল বেরিয়ে যায় তেমনি তোমার কবিতা নির্ঝরিণীর ভিতর দিয়ে ছুটে চলল ?

দেখ্ রমেশ, তোকে পারবার জো নেই। আচ্ছা তাই। তার পর শোন্, খানকুড়ি কবিতা বেরুবার পর সম্পাদক মহাশয় বার বার আমায় অনুরোধ ক'রে পাঠাতে লাগ্‌লেন, পাঠক-সমাজ আমাকে আপনার photo প্রকাশ করবার জন্য বড় ব্যস্ত করে তুলেছে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে একখানি ছবি দিয়ে নির্ঝরিণীকে কৃতার্থ করবেন। বল্‌তে ভুলে গেছি, এর মধ্যেই আরো অনেক কাগজে আমার কবিতা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হ'য়েছিল।

এইবার কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়লাম। কি করি? গোঁপ কামিয়ে মুখে paint ক'রে মেয়ে সেজে কি ছবি তুলব? ধ্যেৎ, সে ভারি বিশ্রী হবে। যা থাকে কপালে, যখন একটা মিথ্যে বলেছি তখন তাকে ঢাকৃতে হাজার মিথ্যে বল্‌তে হবে। নইলে যে বড় ভয়ানক!

তুমি ত জান, সুন্দর চেহারা পেলেই আমি তা album-এ তুলে রাখ্‌তাম? একদিন তাই থেকে এক পারসি মেয়ের photo নিয়ে কপাল ঠুকে দিলাম পাঠিয়ে। সে অব্যর্থ সন্ধান ব্যর্থ হ'বার নয়, একেবারে পাঠক-সমাজের বুকে মরণ বেঁধা বিঁধ্‌ল। তারপর চারিদিক হ'তে বুক যায় প্রাণ যায় শব্দ।

আমাদের পিছন হ'তে কে বলে উঠ্‌ল, জয় কবির জয়, ধন্য ধন্য হে কবি, ধন্য তোমার কবিত্ব,—সতু তোর পেটে এত মতলব খেলে, আর শুয়ার তুমি ডিবেটিং ক্লাবে কোন মত জিগেস করলে বল, আমি কি জানি! ধড়িবাজ! আমি হেসে অতুলকে হাত ধ'রে কাছে বসিয়ে বললাম, দেখ্ বাঙ্গাল, এর মধ্যে অত খেপিস নি, কবি দিব্যি জমিয়ে তুলেছে রে, ওকে শেষ করতে দে।

কবি আরম্ভ করলেন, তার পর ঝুড়ি ঝুড়ি আস্‌তে লাগ্‌ল। অতুল বল্‌ল কি ল্যাংড়া আম? কবি বললেন, দূর্ তা কেন—চিঠি, চিঠি, প্রেমপত্র। অতুল আর বসে থাকতে পারল না, দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল, বল্, মাইরি! তোকে? বেটাছেলেরা প্রেমপত্র পাঠালে, অ্যাঁ!

কবি বল্‌লেন, সাধে তোকে বাঙ্গাল বলি, আমায় পাঠাবে কেন, অরুণা দেবীকে। আমি প্রায় সকলকেই এক রকম করে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলাম, কিন্তু এক ব্যাটা কিছু-তেই বাগ মানতে চাইল না। সে লোকটা শ্রদ্ধাস্পদাসু থেকে আরম্ভ করে ম্যালেরিয়া জ্বরের মত নিত্য এক ডিগ্রী করে প্রমোশন নিয়ে প্রিয়ে, প্রাণতমে, প্রাণাধিকা সব শেষ ক'রে ফেলেছে।

হাসির চোটে আমাদের দম বন্ধ হবার জোগাড় হ'য়েছিল। অতুল বল্‌ল, এইবার বেটার প্রাণান্ত নিশ্চয়ই! কিন্তু এ সকলের সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক? তুই ত আর তাকে বিয়ে করবি না!

কবি রেগে বললেন, তোমরাই বল, আমাকে আর তবে বল্‌তে বল্‌লে কেন? জোড় হাত ক'রে বল্‌লাম, মাপ কর কবি, বড় অন্যায় হয়েছে।

কবি বললেন, তার পর একদিন...। অতুল বলে উঠ্‌লো, সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, লক্ষিছাড়া, থাম্, ওকে বল্‌তে দে।

কবি বললেন, একদিন একটি মেয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে সাদাকথায়, অরুণা দেবীকে লিখে জানালেন, আপনার লেখা আমার বড় ভাল লাগে কিন্তু একমাস অন্তর একটী ক'রে লেখা পড়ে আমার তৃপ্তি হয় না। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করতে বড় ইচ্ছা করে, যদি অপরাধ না নেন তা'হলে আপনার সঙ্গে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করব। সত্যিই বল্‌ছি, এই আড়ম্বরহীন ছোট চিঠিখানিতে যে কি পেলাম তা বলতে পারব না। ক্রমে আমি আর কোন প্রকারেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। সে লিখে জানাল, সোমবার দিন বিকালে আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে যাব। ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ শুথিয়ে গেল! এখন উপায়? চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। নিরুপায় হয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাবার মতলব করছি—এমন সময় বৌ-দি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হয়েছে

ঠাকুর-পো? অমন ক'রে ব'সে আছ কেন? আমি বললাম, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে বৌ-দি, এখন কি করি?

কি সর্ব্বনাশ হয়েছে শুনি? নিশ্চ বুঝি কবিতার খাতায় কালি ফেলে দিয়েছে?

এত দুঃখেও বৌ-দি'র কথায় হাসি এল। তাঁকে ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়ে বল্‌লাম, শুনে হেসে তাঁর ত ফিট হবার জোগাড়। বল্‌লেন, বাবা বাবা, এতও পেটে ছিল, মিট মিটে ডাইন কোথাকার!

আমি বললাম, যত ইচ্ছে পরে গালাগাল দিও, কিন্তু একটা উপায় করে দাও, কাল সোমবার। বৌ-দি অত্যন্ত সহজভাবে বললেন, এক কাজ কর—সে আসুক তার পর তাকে সমস্ত কথা খু'লে বল। আমি বললাম, তার চেয়ে একটা সহজ উপায় আমার মাথায় এসেছে। আজকের মেল-এ দিই চম্পট। বৌ-দি বললেন, আচ্ছা আমি যদি তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করি তা'হলে আমায় কি পুরস্কার দেবে? আমি বললাম, যা চাইবে। বৌ-দি বললেন, বেশ তিন সত্যি কর, যদি এই মেয়েটীর বয়স হয় পঞ্চাশ আর কুমারী হয় তাহলে একে বিয়ে করবে? আমি বললাম, ধ্যেৎ। বৌ-দি বললেন, আর যদি পনেরো হয়? আমি বললাম, পনেরোর চেয়ে পঞ্চাশটাই প্রার্থনীয়।

সোমবার দিন বিকালে একখানা গাড়ী আমাদের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে দাঁড়াল! আমি ঘরে খিল দিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দুই পরে বৌ-দি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌লেন। আমি বললাম, চলে গেছে ত? বৌ-দি বললেন, হাঁ বিদেয় করেছি, বক্‌সিস্ দাও। আমি সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম বটে কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে উঠ্‌ল। বৌ-দি'র সঙ্গে বাইরে আস্‌তেই হঠাৎ তিনি আমার হাত ধরে একটী ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে বললেন, এই নাও ভাই তোমার অরুণাকে; আলাপ সালাপ কর—তারপর পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে ছুটে চলে গেলেন।

অতুল টেবিল চাপড়ে, পা চাপড়ে কবিকে ঝাঁকানি দিয়ে চীৎকার করে এক মহা ব্যাপার করে তুল্‌ল। আমাদের পাশে একজন কে দুই হাত দিয়ে পেটের কাপড় চেপে ধরে অতি কষ্টে হাসি থামাতে চেষ্টা কর্‌ছিল, কবির বর্ণনা এত মুগ্ধ হয়ে শুন্‌ছিলাম, গোরা কখন যে আমাদের পাশে এসে বসেছিল তা বুঝ্‌তে পারি নি। সে একটু সংযত হয়ে বললেন, তারপর?

কবি বল্‌লেন, তারপর আর কিছু না। সব ত বল্‌লাম।

আমরা এক সঙ্গে সকলে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লাম, ও হবে না, সমস্ত বল্‌, ঘরে এসে কি কর্‌লি?

কবির সুন্দর মুখখানি যেন কিসের আবেগে আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল।

কপাল থেকে এক গোছা কোঁকড়ান চুল সরিয়ে আকাশের দিকে একবার চোখ দুটীকে তুলে বল্‌লেন, তাকে দেখ্‌লাম।

গোরা মহা খাপ্পা হয়ে বলে উঠ্‌ল, দেখ্‌লে তা' ত জানি, চোখ থাকলেই দেখে। কি কবিতা বা গান দিয়ে তাকে বরণ কর্‌লি তাই শুন্‌তে চাই।

কবি উদাসীন ভাবে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বল্‌লেন, আমার কবিতা-সাগর-মন্থন করে যে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হ'লেন তাঁকে নূতন করে কি কথা দিয়ে স্তুতি করব? আমি কেবল দেখ্‌লাম!

কথাগুলি বল্‌বার সময় কবির চোখ দুটী জলে ভরে গিয়েছিল। তিনি আপনার মনে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে আরম্ভ কর্‌লেন—

> আমারে তুমি বেসেছ ভাল নীরবে
> আমি জানি গো তা জানি,
> হৃদয় মম উঠিছে দুলি' গরবে
> পুলক ভরে কাঁপিছে তনুখানি।

কবিকে এমন ভাবে বিভোর কখনও দেখিনি, সম্ভ্রমে আমার মন তাঁর প্রতি নত হ'য়ে গেল।

গোরা বল্‌লে, আমি তোমাদের ওসব ধোঁয়ার মধ্যে ঢুক্‌তে পারি না, আমার দম আট্‌কে যায়। স্পষ্ট কথায় বল—দেহি পদপল্লব . . . ।

তাকে বাধা দিয়ে অতুল গলায় চাদর দিয়ে হাত জোড় করে ব'লে উঠল, দোহাই গোরা, ও সব নয়, ও তোকে একদম মানায় না ; বরং ভূতের মুখে রাম নাম শোভা পায় কিন্তু তোর মুখে সংস্কৃত কিছুতেই বরদাস্ত হয় না !'

বৈঠকখানার একদিকের জানালার ঝিলমিলিগুলির ভিতর দিয়ে হঠাৎ যেন কি এক রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনা গেল। সে কি চাপা হাসি ?

এপ্রিল, ১৯১৮

রক্ত সাঁঝে সোনার ফসল এল চাষীর ঘরে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

বুরিয়ে নিয়ে সোনার কলস অস্তসাগর জলে,
সন্ধ্যামণি ফির্‌ল বিজনগেহে,
ছোট্ট তারার টিপ্‌টি ভালে উজল মাণিক জ্বলে,
নীলাম্বরী জড়িয়ে কণকদেহে।
পিঠের 'পরে কাজলচুলের গুচ্ছ হাওয়ায় ওড়ে,
বাঁধ্‌ল না চুল রইল এলোমেলো।
এমনি সময় নৌকাখানি কিষাণ ধানে ভ'রে
ক্ষেত হ'তে সে কুঁড়েয় ফিরে এলো।

পাকা ধানের আঁটির ভারে নৌকা ডুবুডুবু
কাঁচাসোনা রাখ্‌লে কি ভুর্‌ ক'রে ?
কিম্বা রাঙা বৌ'টি ঘাটে হ'য়ে ঈষৎ উবু
উদ্‌লাপিঠে কলসখানি ভ'রে !
ভর বছরের অনেক আশা অনেক চাওয়ার নিধি,
চাষীর ঘরে এলো শরৎ বেশে,
গড় হয়ে তাই প্রণাম ক'রে স্মরে' দয়াল বিধি
শরৎ মেঘের মতন কেঁদে হেসে।
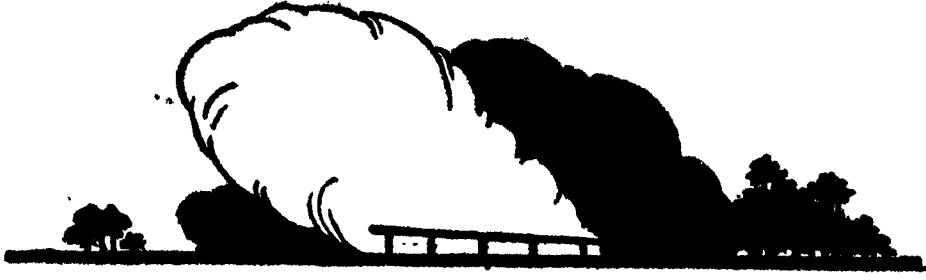
মানব লতিকা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ও-পাড়ার চন্দর ডাক্তারের কখনও 'কল' আসে নি। যে দিন এল সে দিন দুর্যোগের রাত। ঝড় হয়ে গেছে। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, পথে যেখানে-সেখানে জল আর কাদা, গ্যাসের মরা আলোয় আর আকাশ-চেরা লক্‌লকে বিদ্যুতের ঝিলিকে ভিজে আঁধার জগৎটা দেখাচ্ছে পাঁকে ঢাকা এঁদোপড়া দুঃস্বপ্নের মত। বাড়ীখানা ছোট, ঢুকতে একটা সরু পিছল গলি, তার পর হাত দশেক উঠান, চারদিকে চাপ চাপ আঁধার, আঁস্তাকুড় আর কলতলা, শ্যাওলায় কালো ভিজে দেওয়ালের গায়ে টেমির ম্যাড়মেড়ে আলোর ঝিকিমিকি। বুঝি ঐধারে করোগেটেড চালের তলায় রান্না হয়, সিঁড়ির নীচে কয়লার রাশি, মাথায় অন্ধকারে কোথায় ঘুলঘুলিতে পায়রার বাসা। উপরে উঠতে সরু খাড়া অন্ধকার সিঁড়ি, বাড়ীটাময় কেমন একটা গুমোট গন্ধ, আটকানো হাওয়া, থমথমে আঁধার।

সিঁড়ি উঠে সামনে একখানা বড় ঘর, ময়লা বিছানায় বসে একটি মেয়ে। ডাক্তার ঢুকতেই মাথায় কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল, ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে দু'চার বার সঙ্কোচে মাথা তুলে চাইল, ময়লা আঁচলটা খুঁটতে খুঁটতে দু'চার বার ঢোঁক গিলল, তার পর বাধ বাধ স্বরে বলল, খোকার অসুখ।

চন্দর ডাক্তার তার নিটোল ভুঁড়িটি নিয়ে মেয়েটির গা ঘেঁসে গিয়ে হাসি হাসি মুখে দাঁড়াল, চাপ দাড়িতে হাত বুলিয়ে গলা খাঁকারী দিয়ে খোকার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, তা আর কি হয়েছে? ভাল হয়ে যাবে। কই দেখি—? সে ওদিক দিয়ে ঘুরে তক্তপোসের ও-পাশে গিয়ে খোকার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়াল, তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের মত বাঁকা রেখায় আঁকা উদাস চোখ দু'টি ডাক্তারের বড় বড় ঘোলাটে চোখের ওপর সসঙ্কোচে তুলে বলল, পরশু খেলতে খেলতে হঠাৎ শুয়ে পড়ল, গা-হাত-পা নীল হয়ে ঘাম দিয়ে নেতিয়ে এল, সেই থেকে নাগাড় জ্বর। বলতে বলতে গলা তার ধরে এল, গাল বেয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল, খোকার কপালে-রাখা হাতখানা কাঁপতে লাগল।

চন্দর। তা' হোক, এ-আর এমন কি অসুখ? একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, বুকে সর্দ্দি জমেছে। হুঁ, আচ্ছা, পিঠটা দেখি, একটু ফিরিয়ে ধর তো, হ্যাঁ, এই—এই ঠিক হয়েছে, থাক থাক, ওতেই হবে। হুঁ—রাধে শ্যাম, শ্রীহরি, রাধে

জ্বায়। কাগজ কলম আছে তো? কি বলছিলে, হাত পা নীল হয়ে গেছিল?

সে। হাঁ, একেবারে কালি ঢেলে নীল, সে খানিক-ক্ষণের জন্যে, তার পর জ্বর—

চন্দ। ভয় কি, বাছা, কাঁদতে আছে? ছিঃ! কই কাগজ কলম—

সে ডাক্তারের দিকে সমানে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে, সে চাউনিতে কি উদ্বেগের প্রশ্ন, কি করুণ আশা, কি শরণ যাচ্ঞা! বার কতক 'কাগজ কাগজ' করার পর হুঁস পেয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘুলঘুলি থেকে ময়লা বালির কাগজ আর দোয়াত কলম এনে দিল। ডাক্তার বিছানায় বসে ঝুঁকে পড়ে প্রেস্‌ক্রিপসন্ দিল, মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, কি নাম দেব গা? সে তখনও তেমনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে। ডাক্তার অগত্যা বুড়ি ঝিকে জিজ্ঞেস করল, কর্ত্তার নাম কি গা ঝি? বুড়ী নতুন এসেছে, মাথার কাপড় টেনে একটু বোকার হাসি হেসে বলল, আমি কি জানি গো বাবু, আমায় ঐ যে গে নোটোর মা বদলী দে গেছে।

অগত্যা ডাক্তার আবার তার দিকে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, আপনারা, এ ও ইসে—তোমরা?

সে। কায়স্থ

চ। সে তো হ'ল, কায়স্থ কি?

সে। সরকার।

অগত্যা চন্দর ডাক্তার লিখল, For Mrs Sarkar's baby—লিখতে লিখতে মাথা না তুলেই জিজ্ঞেস করল, এটা কত নম্বর?

সে। তের

চ। ছিদাম মুদির গলি, না?

তার পর পকেটে ফাউণ্টেন পেন রাখতে রাখতে ভাসা হাসি হাসি চোখ মেয়েটির মুখে তুলে ডাক্তার দেখল তখনও সে ঠায় তেমনি প্রাণ আঁকুপাঁকু করা চাউনি নিয়ে তার মুখ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিকে কি চাওয়া যায়! যেন বলির পশু, ঘাতকের দিকে দেখছে।

চ। এই অষুধটা দিনে তিনবার খাওয়াবে, শ্রীরাধা-বল্লভ, ইসে—ওর নাম কি, চার ঘণ্টা অন্তর; ভয় পেও না, বাছা, ভয় পেও না, জগজ্জীবন ঠাকুরের নাম কর, আমি আবার সকালেই আসব, এই গিয়ে, ওর নাম কি, ধর আটটা কি ন'টা নাগাদ।

ডাক্তার থপ থপ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে সেও এল, কি যেন বলি বলি করে ডাক্তারের পিছু পিছু চলতে লাগল। ডাক্তার যাই গাড়ীর পা-দানীতে পা দিয়েছে; তখন এদিকে সেও দরজা ধরে সামনে ঝুঁকেছে, কাঁপা হাতে বুকের আঁচলটা টানছে, কখন মাথায় টেনে টেনে দিচ্ছে। গাড়ীর দরজা বন্ধ হতেই সে হঠাৎ লুপ্ত বাক ফিরে পেয়ে যেন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল, আপনার বিজিটটা আমি দেব, তিনি রেঙ্গুনে দোকান করেন, খপর দিয়োছ, হাতে আমার—এই দু' এক দিনে—

চ। তা' থাক না, হেঃ! এ আবার একটা কি—কথা বললে? ওসব গিয়ে এখন থাক না, ছোঃ, সে হবেখন্, এখন থাক! তার আর ভাবনা কি? খোকা ছেলে মানুষ, ওর টাকা কোথা, সে হবেখন্। হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে। সে হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, ডাক্তার বাবু, একটু নেমে আসুন, ডাক্তার বাবু, যাবেন না, ওরে বাবা, গাড়োয়ান—! ডাক্তার তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এগিয়ে এসে বলল, কেন, কেন, এই যে, আমি তো যাই নি। হেঃ, একেবারে ছেলে মানুষ! ভয় পেয়েছ বুঝি? শ্রীহরি শ্রীহরি—হি হি হি। সে ডাক্তারকে নিয়ে আবার পিছতে পিছতে উঠানে এল। সে কি চাহনি, যেন কালীপূজার বলীর পশু, চোখদুটি তেমনি ভয়কাতর ও বিহ্বল। কি বলতে গিয়ে চোখ দিয়ে তার দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল, মুখ ঢেকে দেয়াল ধরে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার বলল, "এ-হে-হে-হো ছি ছি ছি, কাঁদতে আছে? খোকার সামান্য জ্বর, ভয় কি, তাঁর শমনদমন নাম নাও দেখি, তিনি যে রয়েছেন, জীবের কাছে কাছে রয়েছেন। খানিকটা কেঁদে সে হালকা হল,

চোখ মুছে কাঁপা ঠোঁটে বহু কষ্টে সে বলল, আপনার ঠাকুরের দিব্যি, খোকার কি হয়েছে, বলুন।

ডাঃ। সত্যি বলছি, একটু অমনি জ্বর। বুকটায় সর্দ্দি জমেছে, তা' ও কিছু না। এই দেখ না, কালই ন'টা নাগাৎ আসছি, তখন দেখে শুনে আর একবার—

সে। খোকা বুঝি বাঁচবে না, ডাক্তার বাবু, আমার বুকের মাঝে কি যেন আঁচড় পাঁচড় করছে—

ডা। এ রকম দুশ্চিন্তা করতে আছে! ওতে ক'রে যে, অকল্যাণ না হবার হ'লেও অকল্যাণ ডেকে আনে। আপনার—ইসে—তোমার গিয়ে কলকেতায় কেউ নেই?

সে মাথা ঝাঁকি দিয়ে জানাল, না। ডাক্তার চিন্তিত-ভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তাই তো! হুঁ, ইসে, কেউ নেই। তা' বেশ, আমি তো আছি, তোমারই আপনার মানুষ ধরে নাও না আমায়। রোগীর ঘর, খুব হাসিখুশী নিয়ে হালকা মনে আশা বিশ্বাস ধ'রে থাকতে হয়। চোখের জল ফেলতে নেই, বিপদ ডাকতে নেই। এই তো হাতিবাগানে আমার বাড়ী, এই তো দশ মিনিটের পথ; ঝি চেনে, তুমি ওপরে রুগীর কাছে যাও বাছা—বলে, স্থূল গৌর দেহখানি নিয়ে ডাক্তার গুটি গুটি বেরিয়ে এল, গ্যাসের আলো তার মসৃণ টাকের ওপর ও সোনার চশমার ফ্রেমে পড়ে চক্ চক্ করতে লাগল। গাড়ী ছেড়ে দিল। তখনও সে দুয়ার ধ'রে তেমনি দাঁড়িয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে চন্দর ডাক্তারের ঘুম আর হ'ল না। আজ এই পনর বছর চন্দর ডাক্তারী করছে, হাজার দু'হাজার রোগী নিদেন পক্ষে ঘেঁটেছে, কত মড়কে মহামারীতে ঘরে ঘরে আসন্ন মৃত্যুর শিয়রে রাত কাটিয়েছে। কত আছাড়ি বিছাড়ি কান্না, কত রুদ্ধ পাষাণের শোক, ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর মত কত অশ্রুবিকল চোখ, শ্লথ কবরী, বিবশ লাবণ্যময়ী অঙ্গলতা দেখে দেখে ডাক্তারের হৃদয় প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। এমনটা কিন্তু তার কখন হয় নি।

চন্দর ডাক্তারের এক পিঠ লম্বা চুল, কখনও পিছনে ঝুঁটি বাঁধা, কখন এলো—সেই তেল চুকচুকে বাহারী চুলে সোজা সিঁথি; চন্দ্রের কপালে তিলক, হাতে বুকে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, কোটের উপর নামাবলী—চন্দর এ-পাড়ার হরিসঙ্কীর্ত্তনের চাঁই। খোলের আওয়াজে তার চোখে ধারা বয়, কীর্ত্তনীয়া যদি গায়, "ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বই কি রে," অমনি ডাক্তার তার সুমিষ্ট পঞ্চমে আখর দিয়ে ওঠে, "ভাব না হয়ে যায় কোথা," "ওরে, চাঁদের উদয়ে সাগর যথা," "রাকা শশি হেরি চকোর যথা।"

তার নাদুস নুদুস চলন, গৌর বর্ত্তুলাকার শরীর, হাসি হাসি মুখ—পিছন থেকে হঠাৎ দেখলে পেলায়দের বাড়ীর সরকারী রাঁড়াদিদি বলে ভ্রম এনে দেয়। ডাক্তারের হালকা প্রাণ, ভাবের ফুলঝুরি তার ঝুর ঝুর করে উঠেই ফুল কেটে কেটে নিবে যায়, রসের স্বর্ণ কলসী তার ভরে আর খালি হয়, প্রাণ বৃন্তে তার অমন কত সেফালী ফোটে আর রাঙা বোঁটা ধবল অঙ্গ নিয়ে গন্ধে আমোদ করে ঝরে যায়।

এবার কিন্তু একি হ'ল? সে-রাত একটা থেকে ছ'টা অবধি বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রেই কেটে গেল। ঘুম কি আর হয়, চোখের কাছে ও রকম ভয়াতুর মুখখানা ঘুরে ঘুরে বেড়ালে ঘুম কি হতে চায়! যতবার চোখের পাতা জুড়ে একটু অমনি তন্দ্রার আবেশ আসে ততবারই তাই—সামনে এসে দাঁড়ায়, ঢেউ খেলান পাতলা আলগা ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে, গাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছে, প্রবালের রঙের চুড়ি পরা রোগা রোগা হাত দু'টি কচলাচ্ছে, দীর্ঘশ্বাসে বুকের আঁচল উঠছে নামছে, আর বাঁকা রেখায় টানা চোখের সেই প্রাণ আঁকুপাঁকু করা চাউনি,—সে চাউনি চেয়ে দেখাও যায় না, না দেখেও উপায় নেই, চোখ আপনি টেনে নেয়। আহা! ওর কি কেউ নেই? আহা! আহা! যতবার সে চোখের কোল ভরে উদয় হয় ততবার ডাক্তারের সারা প্রাণ ঢেউ তুলে ছুটে আসে তাকে নিজের মাঝে ডুবিয়ে নেবার জন্য। আচ্ছা, এটা কি দয়া? সে তো বয়সে ডাক্তারের মেয়ের মত, তবে দয়াই বুঝি হবে।

বেলা আটটায় কাজ কর্ম সেরে দু' বাড়ী রুগী দেখে চন্দর ১৩ নম্বরে এসে নামল। দিনের আলোয় তবু বাড়ীখানা ওরকম ছন্নছাড়া প্রেতপুরীর মত দেখাচ্ছে না। তবু হাজার হ'লেও কেমন যেন পড়ো জনমনিষ্যির বাস-ওঠা যক্ষপুরীর মত, দেখলে প্রাণটার কোথায় খাঁ খাঁ ক'রে ওঠে। পা টিপে টিপে চন্দর সন্তর্পণে সিঁড়ি উঠছিল, ওপরে কোথায় ছেলেপিলে খেলা করছে, কত কি আবোল তাবোল বকছে। তারপর কানে গেল, "তাই তো দিদি, কি হবে তবে? ভয়ে আশঙ্কায় কাঁপা স্বর, হ্যাঁ, এ তারই গলা বটে। মোটা মেয়েলী আওয়াজে একটু দূর থেকে জবাব এল, হ্যাঁ, ভাই, উনি বললেন, আজ কাল শহরে খুব ইনফ্লুঞ্জা হচ্ছে। আজ কাল যেমন ম্লেচ্ছ কাণ্ড, রোগের নামও সব তেমনি আদেখ্‌লে উদখুট্টি,—ইনফ্লুঞ্জা, টাইফট, বেরিবেরি, টেবার কেলে-সিস—

কি হবে, দিদি, কি হবে তা' হ'লে?

কি আর হবে লা? অত ভয় ভাবনা কিসের? সেবা যত্ন কর, ডাক্তার দেখাও, সেরে যাবে। ছেলে-পুলের রোগনাড়া কি আর হয় না, বাপু? না, আমরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কচ্ছি নে? ষষ্ঠীর কৃপায় যা হোক এতগুলো গুঁড়োগাঁড়া তো হয়েছে? কি রোগ গা, খোকার রোগটা কি?

তা কি করে জানব, বল? নেতিয়ে আছে, যেন হুঁস নেই। আর সেই নীল হাত পা যদি দেখতে দিদি, যেন নীলে চুপিয়ে দেছে।

ভাল ডাক্তার দেখাও না, নীরু। এই কৈলেশ ডাক্তার রয়েচেন, তারপর গিয়ে কালী বাগচী, গড়পারের পরাণ ডাক্তার, হাতিবাগানের ইন্দির পালিত। কত্তার রোগে তো আর কাউকে ডাকতে বাকি নেই, ছিষ্টির ডাক্তার কবরেজ হাকিম বদ্দি—

ও মা ডাক্তার বাবু এয়েচেন। চন্দরের জুতোর শব্দে সাত বছরের একটি নোলক-পরা ফুটফুটে মেয়ে উঁকি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও দু জোড়া ছোট ছোট গোল গোল চোখ আর হাঁ করা মুখ উঁকি মেরে লুকিয়ে গেল। তারপর সবাই মিলে ঝমর ঝমর থপ্ থপ্ ছুট। ডাক্তার ওপরে এসে উঠতেই নীরু এল, তার পিছনে আঁচল ধরে তিনটি ছেলে মেয়ে, সব ছোটটি তার গম্ভীর জজের মত মুখ থেকে আস্তে আস্তে বুড়ো আঙুলটা বার ক'রে বলল, মা, ডাক্তাল বাবু এয়েত্তে।

চন্দ। খুকি, তোমার নাম কি গা?

খু। শ্রীমতি নীহারিকা দাসী।

চন্দ। বেশ, বেশ, খাসা নাম তো তোমার! ঝি কই?

খু। বাজারে গ্যাছে।

চন্দ। ফরসা বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় আন-দিকিন, খুকী। আর এই ঘরটা ঝাঁট পাঁট দেও। একটু ল্যাবেণ্ডার আছে? শ্রীহরি মধুসূদন! জানলাগুলো খুলে দাও, কেশব কংসনিসূদন! রুগীর ঘর আলোয় বাতাসে সুগন্ধে শোভায় হাস্‌বে জমজম করবে, ডাক্তারী তো নয়, এ হচ্ছে মায়ের ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে যুদ্ধ, কি জান, হরের্নামৈব কেবলম্—"

খুকীকে আর কিছু করতে হ'ল না, নীরবে কলের মত নীরু সব করে গেল। ঘরে একটু জল ছড়া দিইয়ে, ধুনো জ্বালিয়ে হাসি হাসি মুখে ডাক্তার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করে বিদায় নিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই গলির মোড় অবধি তার পিছু পিছু এল একজোড়া সশঙ্ক সঙ্কুচিত পা আর ব্যাকুল প্রশ্নভরা চাউনি। চন্দর হাসি হাসি আধ-বোঁজা চোখে মাথা নেড়ে নীরবেই এ যাত্রা ভরসা দিয়ে গেল।

রাত্রে ঠিক বারটায় আবার তেমনি ডাক। আবার সেই মেঘলা রাত, শুষ্ক হীম প্রেতপুরী বাড়ী আর অশ্রু-বিকল ভয়াতুর মা। হাঁস ফাঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক্তার উপরে এসে দেখল নীরু খোকার শিয়রে পা গুটিয়ে বসে, পরণে একটা ময়লা সাড়ী, পায়ে হাতে খড়ি উড়ছে, চুল উস্কখুস্ক, খোঁপা এলিয়ে পিঠে ঝুলে পড়েছে, বিহ্বল বিস্ফারিত চোখ দু'টির মাঝে আশঙ্কার অতল কালো গহ্বর, আলগা ঠোঁট দু'টি শুকনো, অবশ, থরথরে। নিজের নিরুদ্বেগ খোলা চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে

চেয়ে ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ রকম করলে চলবে না, বাছা ; দুশ্চিন্তা করে আপনি খোকার বিপদ ডেকে আনছেন। মা হয়ে কি রকম তোমার বুদ্ধি, বাপু,—হরি হরি। চন্দর ডাক্তারের ভরা গলার জোর কথায় সে এতটুকু হয়ে জড়সড় ভাবে উঠে দাঁড়াল, মাথা দু'বার তুলে আর নীচু করে কেঁদে ফেলল।

ডা। ছিঃ।

নীরু ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে শক্ত কাঠ হ'য়ে রইল, যেন এইবার ডাক্তারের হাতে মার খাবার জন্যে প্রস্তুত। একটুখানি ধমকের এতখানি ফলে চন্দরের কেমন লজ্জা করতে লাগল, এই অসহায় দুর্ব্বল প্রাণীটির জন্য করুণায় বুক আথল পাথল করে উঠল। সে মিষ্টি হাসি হেসে বলল, ছিঃ, কাঁদ কেন, গা? মনে সাহস আন, তুমি হাস দেখি, তা' হ'লেই খোকা সেরে উঠবে। তখনও তার গাল বেয়ে টস্ টস্ ক'রে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে বুকের ওপর পড়ছে, কাঁপা আলগা ঠোঁট কোন গতিকে একটু সামলে সে মরা হাসি হাসল, বলল, আপনি বাঁচান, পায়ে পড়ি, খোকাকে বাঁচান। দেখেই বোঝা যায় ডাক্তারের চেয়ে সে অনেক ছোট—তার মেয়ের বয়সী। আবার চোখে মমতা মাখিয়ে ডাক্তার মাথা নাড়তে নাড়তে তার দিকে চেয়ে হাসল, তাইতে সে যেন কত বর্ত্তে গেল, আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলল, এবার একটু তাজা হাসি হাসতে চেষ্টা করল, নড়ে চড়ে একটু স্ববশ হয়ে দাঁড়াল।

চ। খোকা তো বাঁচবেই গো, কিন্তু মনে খুব সাহস ভরসা রাখ্‌তে হবে, তোমার দিবা রাত্র এ রকম অমঙ্গল আশঙ্কায় ঘরের আকাশ বাতাস ভার হয়ে রয়েছে। রোগ-নাড়া বিপদ-আপদ এ সব তো ফাঁকা কথা নয়, জলজীয়ন্ত জিনিষ, মানুষের চারদিকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পেঁচার মত উড়ছে, একটু ছুতো পেলেই আসে, ডাকলে তো কথাই নেই। খোকার জীবন আমার হাতে দিয়ে তুমি বেশ হালকা মনে থাক দেখি, বাছা! শ্রীমধুসূদন হরি। সে মাথা নেড়ে সায় দিল। নীরু কি করবে? ডাক্তার এলে তো তার ভরসা আসে, কিন্তু সে চলে গেলেই যত গোল ; সব যেন আবার ফাঁকা হয়ে যায়, অগাধ জলে পড়ে যেন ভর দেবার কিছু পাওয়া যায় না।

এই ভাবে সাত দিন আরও চলল। সে যেন যমে মানুষে টানাটানি। যমের দিকে ভয় ব্যাকুল মা, আরোগ্যের দিকে মোটা থপথপে দেখনহাসি ডাক্তার। ডাক্তার এলে সব দিক ফরসা হয়, খোকা শুধরে ওঠে, সে পিঠ ফেরালে খোকার হাত পা নীল হয়ে যায়, ভয়-তরাসে মায়ের চোখে বাণ ডাকে, বাড়ী ঘর কালো থমথমে হয়ে আসে, খোকা যায় যায় হয়। চন্দর ডাক্তারের প্রফুল্লতা ভরা অটের প্রাণশক্তিই যেন এই রোগী আর তার মা'র খোরাক, সূর্য্যোদয়ে পদ্মের মত সে কাছে এলে এরা ফোটে, সে দূরে চোখের অন্তরালে গেলে এরা মুদিত ও ম্লান হয়ে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দর ডাক্তার একদিন হুগলীতে রুগী দেখতে গেছল। পরের দিন সকালে এসে দেখে সব শেষ হয়ে গেছে। নীরু তখন মেঝেতে লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পিঠময় একরাশ এলোমেলো চুল, কতক মাটিতে, কতক হাতে মুখে এসে পড়েছে, যেন কালোর ঢেউ খেলান বন্যা। চুলের ফাঁকে ফাঁকে বন্ধ চোখের কালো পাতা, ফোলা ঠোঁট, নিটোল চিবুক দেখা যাচ্ছে, আজ যেন এত শোকের মাঝে ধূলি ধূসরিতা দশায় এই নিতান্ত সাদাসিধে মানুষটিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। শোকও কি কুৎসিৎকে সুন্দর করে, না, এ চন্দরের চোখের নেশা, বুঝি বা বুকের করুণা? আমাদের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি সব চেয়ে সুখ-মুহূর্ত্ত বুঝি সমান আনন্দের, শুধু একটু দেখার ভঙ্গীর তফাৎ ; নাটমঞ্চে দাঁড়িয়ে এই খেলা খেলতে খেলতে দেখা এক, আর দর্শকের আসন থেকে দেখা আর। সেই নটরাজের লীলা বুঝি সবই সমান, কেবল আমাদের বুকের রসে ছুপিয়ে বুঝি কখন দুঃখ হয়, কখন সুখ হয়, কখন্ হাসি হয়, কখন কান্না হয়। চন্দর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল তারপর "রাধা-মাধব রাধা-মাধব"

নাম করতে করতে ঠোঁটের কোণে একটি তৃপ্তির হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খোকাও মরল আর ডাক্তারের ও-পাড়ায় যাবার ছুতোও ফুরল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন ভূতে পেল! ছিদাম মুদীর গলির আশে পাশে এক পোয়া পথের মধ্যে দিয়ে ডাক্তারের গাড়ী গেলে ঐদিকে যাবার একটা ঝোঁক তাকে বহু কষ্টে হজম করতে হ'ত। সারা শরীর প্রাণ তার ঐদিকে চোঁ চোঁ করে টানত, মন কেবলি বলত, একবার দেখে এলে হয় না? আরও তো ছেলে পুলে আছে, যদি কারু অসুখ হয়! আহা, ওর কেউ নেই, কে বা ওদের দেখে। ডাক্তার প্রাণপণে চক্ষু মুদে বল্‌ত, "ঠাকুর তোমারই লীলা, রাধামাধব রাধামাধব শ্রীহরি শ্রীহরি।" ততক্ষণে গাড়ী সে অঞ্চল পেরিয়ে যেত। সব চেয়ে বিপদ হ'ল রাত্রে। ঠিক বারটার সময় ছ্যাৎ করে কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়ে ডাক্তার তন্দ্রার ঘোরে শুনত, বুড়ী ঝি ডাকছে, ও বাবু, বাবুগো— চমকে জেগে উঠে দু'হাতে কাছা গুঁজতে গুঁজতে অবশ আলুথালু শরীরটাকে কোন গতিকে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে চন্দর দেখত কেউ কোথাও নেই। একি নিশি ডাক? ধপ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে "আঁঃ উঃ হরি হরি"-আদি নানা ব্যক্ত অব্যক্ত শব্দ করতে করতে যদি বা ঘুম এল, তখনই চোখের কোল ভরে কেবলি তার আনাগোনা। কখন নীরুর ভয় বিহ্বল চোখ, কোলে মরা ছেলে, যেন নিঃশব্দে আলগা পায়ে চলছে, হয় ত এক খণ্ড শীতল স্নিগ্ধ তুলতুলে মেঘের মত এসে তার বুকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। যখন বেরিয়ে আবার সামনে দাঁড়াল তখন টানা বাঁকা চোখে অশ্রু সজল হাসির চাহনি, সব শোক তাপ উদ্বেগ ভাবনা তাকে দিয়ে নীরু যেন জুড়িয়ে শীতল হয়ে গেছে। কোলে তার তখন আর খোকা নেই। এই রকম রোজ হত।

এই রকম করতে করতে অমাবস্যার রাত্রে একদিন সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়ল। বাবু, অ-বাবু, বাবুগো! অন্ধকার ঘরে জেগে উঠে দুর দুর করা বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে ডাক্তার ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, বিড় বিড় করে বলতে লাগল, শ্রীহরি শ্রীহরি গোবিন্দ হে গোপাল! খট্ খট্ খটাখট্—অ বাবু, বাবু, বাবু গো! কই না, এ তো স্বপ্ন নয়! ডাক্তার মেঝেয় নেমে হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে চটি জুতো জোড়া সংগ্রহ করল তারপর কাপড় সামলাতে সামলাতে দরজা খুলে বলে উঠল, কেও?

ঝি। আমি বাবু, আমি, ছিদাম মুদীর গলির মোক্ষদা।

চ। কি কি, কি খবর?

ঝি। এস বাবু শীগ্‌গীর করে, খোকা বুঝি যায়, সব্ব অঙ্গ নীল হয়ে গ্যাছে।

চ। কবে অসুখ হ'ল? কোন্ খোকা! আগে খপর দাও নি কেন?

ঝি। ও মা! খপর কি মা দিতে দেয় গা? বলে ওনাকে ট্যাকা দেওয়া হয় নি ক। এই আজ বারটি দিন আর রাত, বাবু, মাথার ওপর দিয়ে গ্যাছে, খোকাকে কোলে নিয়ে ঠায় বসে। আহার নেই, লিদ্রে নেই, রোগা মনিষ্যি, তায় আবার ভয় কাতুরে, বাবা ও-বুঝি যায়।

চা। আ ছি ছি ছি, টাকা কি গো, টাকা আবার কি? ডাকবে, যখন খুশী ডাকবে, দিনে পাঁচবার ডেকে নে যাবে। বুঝেছ! শ্রীহরি শ্রীহরি! দেখ দেখি কি কথা! আমি যে ডাক্তার, মুদ্দোফরাস তো আর নই, যে ঘাটের কড়ি দিয়ে তবে কথা কইতে হবে! ছ্যা ছ্যা ছ্যা, আরে ছ্যা। কই চল দেখি। য়্যা! টাকা!! আরে থু।

আবার সেই বাড়ী, সেই অন্ধকার উঠানে টেমির আলো, সেই উপরের ঘর, সেই রুগ্ন খোকা, আর শিয়রে পা গুটিয়ে বসে শোক বিহ্বল মা। নীরু মুখ ফেরাতে সে শীর্ণ রুক্ষ উদাস মূর্ত্তি দেখে চন্দরের বুক থেকে তার যেন সারা সত্তা দয়ায় গলে বেরিয়ে নীরুকে জড়িয়ে ধরল। ঊর্দ্ধমুখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে উঠে নীরু হঠাৎ কাটা ছাগলের মত ধড়াস করে তার পায়ের ওপর ঘুরে পড়ে গেল। তাকে কোলে করে তুলতে গিয়ে ভিজে চোখে এড়ান স্বরে ডাক্তার বিড় বিড় করে বকে যেতে লাগল, বোকা মেয়ে, আমি যে রয়েছি, শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু, হেঃ, দেখত, হাবা মেয়ে! টাকা কিগো,

টাকা কি, যখন খুশী ডাকবে, হরি হরি, যখন- ইচ্ছে, ইসে, কিনা যখন দরকার।"

সেবার সে খোকা সেই রাত্রেই ডাক্তারের কোলে ঠিক তেমনি নীল হয়ে মারা গেল। চন্দর ঘুলঘুলি তোরঙ্গ থেকে পুরাণ চিঠি ঘেঁটে নীরুর স্বামীর ঠিকানা নিয়ে মুলমীনে তার করে দিল, "Tunu and Khokan dead, your wife penniless, come immediately,—Doctor Roy"—টুনু ও খোকন মারা গেছে. তোমার স্ত্রী নিঃস্ব, এখনি এস।

দশ দিন গেল। কাকস্য পরিদেবনা! খুকীর কাছে চন্দর জানল, নীরুর হাতে দশ আনার বেশি পয়সা নেই। আজ ছ' মাস বর্ম্মা থেকে টাকা আসে নি, নীরুর হাতের ছ' গাছা সোনার চুড়ি, গলার মটর হার, দু গাছা অনন্ত বাজু —সব গেছে দুই খোকার ব্যারামের পথ্য যোগাতে। পরের দিন রাত্রে নীরুর অসাক্ষাতে খুকীর হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে চন্দর বর্ম্মা যাত্রা করল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুলমীন থেকে ডাক্তার আর কলকেতায় ফিরল না। কলকেতা বাস তার পক্ষে ইদানীং এক রকম অচল হয়েছিল। তার পর আবার মুলমীনের নিরাশার পর! নীরুর স্বামী মোহিণীমোহন সেখানে এক রূপসী বর্ম্মী নিয়ে সুখে আছে, দু'জনে মিলে দোকান চালায়। ডাক্তারকে দেখে আমতা আমতা করে বর্ম্মীর জিম্মায় তাকে দোকানে বসিয়ে সেই যে সে গা ঢাকা দিল সাত দিন অপেক্ষা করেও চন্দর তার পাত্তা পেল না। এই ছিপছিপে তেড়িকাটা লক্কা পায়রাটিকে দেখেই ডাক্তার বুঝেছিল, এর দ্বারা নীরুর কোন উপায় হবে না। পায়ের জ্যাতা গোবেচারা নীরুর মত হাবা মেয়ের কর্ম্ম নয় এ রকম উড়ুক্কু স্বামীকে আঁচলের গেরোয় বেঁধে রাখা। এ হচ্ছে ঐ সেয়ানা শক্ত বর্ম্মীর মত ধারাল মেয়েরই কাজ। ডাক্তার কিন্তু খুশী হল কি নারাজ হল এ ব্যাপারে তা' সে নিজেই বুঝতে পারল না। সে যখন নীরুর একটা উপায় করবার জন্য মুলমীন যাত্রা করেছিল তখন তার অন্তরের আধখানা সেই দিকে সায় দিচ্ছিল এবং আর আধখানা মুখ ফুটে বারণ না করলেও কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে বেড়াচ্ছিল। স্পষ্ট ভাষায় বললে দু'জনার কথাটা দাঁড়াচ্ছিল কতকটা এই রকম—নীরুর স্বামী তো রয়েছে, তারই কাছে ওর স্থান। কই আর স্বামী, আর তার দরদ তো কত। তা' হোক, তাকে একবার এনে তো ফেলা যাক"। তা'তে কি লাভ? তা না হ'লে ও-বেচারী যায় কোথা? জায়গা আছে বৈকি। বলই না। তুমি কি আর বোঝ না? "না, না, ছিঃ, তা' হয় না। সে যা' বল, কিন্তু—। কিন্তু কি? কোথায় মরতে রেঙ্গুনে' যাবে, তুমিও যেমন। সব বাধা ঠেলে ফেলে আর নীরু এবং নিজের মাঝে একটা মস্ত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করার তাড়ায় ডাক্তার কিন্তু বেরিয়ে পড়েছিল এই অনিশ্চিত পথে নিছক পরোপকারের খোঁজে। তার পর যখন নীরুর এই অসম্ভব লক্কাজাতীয় উড়ন্ত স্বামী দেবতাটির চুলের টিকির অবধি সন্ধান হারিয়ে ডাক্তারকে ফিরতে হ'ল তখন তার মাঝে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হল। যার প্ররোচনায় তার আসা সে যেন আসন্ন বিপদের কালো ছায়ায় মুসড়ে রইল, আর আসার সারা পথটা ধরে খুঁৎ খুঁৎ করেছিল, এখন হাসি হাসি মুখে মল বাজিয়ে তার সারা প্রাণটা জুড়ে ফি ঘুর ঘুর করে নৃত্য।

বর্ম্মা থেকে ঘুরতে ঘুরতে মোটা সোটা নাদুস নুদুস চন্দর ডাক্তার চুপসে রোগা হয়ে পৌছাল নিজ বাড়ীতে সোণালকাঁদি গাঁয়ে। বর্দ্ধমান অঞ্চলের এই গাঁ-টিতে নিজ পৈতৃক ভিটায় ডাক্তারের স্ত্রী কণকচাঁপা থাকে তার দু'টি ছেলে মেয়ে নিয়ে। ডাক্তার তাদের কলকেতা থেকে টাকা পাঠায় আর বছরে বার চারেক বাড়ী আসে। এ যাত্রা গত আট মাস বাড়ী আসা ঘটে উঠে নি। ডাক্তার এসে উঠানে উঠতেই পায়ের শব্দ পেয়ে কণক এসে দরজা ধরে হাঁ করে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ থ' হয়ে থেকে বলল, ওমা! একি? পোড়া ঘর দোর মনে পড়েচে? পূবের সূর্য্যি পচ্ছিমে উঠেছে?"

চন্দর চোখ নাচিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে নীরব হাসি হাসল। বলল, এতদিন পর এলাম, এখন মুখ ঝামটাগুলো নাই

দিলে? দু'টো মিষ্টি কথা কও লো রাই বিধুবদনী। কণক রাই না হোক, সত্যই কণকপ্রতিমা, লম্বা, ছিপছিপে গৌর, পদ্মের মত চোখ, টানা ভ্রূ, পাতলা রাঙা ঠোঁট, যেন সচল উজ্জ্বল আলোর লতা, বাতাসে কাঁপছে। দোষের মধ্যে কণক শক্ত মেয়ে, মুখরা, স্পষ্ট বক্তা, কাজেই রসিক ডাক্তারের সব আদিরস জ্বলন্ত রূপের এই তপ্তখোলায় পড়ে চড়বড় করে শুকিয়ে যায়। একে নিয়ে কোন গতিকে ঘর করা চলে, আদিরস করা চলে না।

কণ। আহা! কি চেহারা? এ হাড়ির হাল হ'ল কিসে শুনি?

চন্দ। তোমার বিরহে, গিন্নী, তোমার বিরহে—

চন্দর এগিয়ে হাত বাড়িয়ে কাছে আসতে—মরণ! কথাঃ ছিরি দেখ, বিরহ তো কত! বলতে বলতে কণক রান্না ঘরে ফিরে গেল। ডাক্তার কাপড় চোপড় ছেড়ে, "রাধে বল্লভ, রাধে বল্লভ" করতে করতে রান্না ঘরের চৌকাঠে এসে চেপে বসল। সত্যই ডাক্তারের সে তপ্ত কাঞ্চণ বর্ণ তামাটে মেরে গেছে, অমন সুডোল নিটোল ভুঁড়ি বেশ একটু টসকে বসে এসেছে, জর্জ্জ দি ফিপ্‌থ্‌ প্যাটার্ণ গোল চাঁপ দাড়িটি বিলক্ষণ উস্কখুস্ক, মানুষটার সারা আবহাওয়ায় একটা মনমরা ভাব, ঝাঁট পাটের অভাবে দশ দিনের যেন পড়ো ঘরের চেহারা।

চন্দর। হ্যাঁগা, খোকা খুকিকে যে দেখছি নে?

কন। ঐ হারাণীর বাড়ী খেলতে গেছে, যে দস্যি ডাকাতে ছেলে মেয়ে তোমার, হাড় আর মাস আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বাড়ী এলে যে?

চ। কেন আসতে নেই, নাকি? চাঁদ মুখখানি তোমার গিন্নী কতদিন দেখি নি, মনে আছে?

কণ। মরে যাই! আমার পোড়ার মুখ দেখবার জন্যে আহার নিদ্রে বন্ধ। এই আট মাস আমি মরেচি কি বেঁচেছি তার খোঁজ নেয় কে তার ঠিক নেই। চাঁদমুখ! ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার!

চ। তা' মার, তোমার হাতের ঝ্যাঁটাও অমৃত; খবর কি আর সত্যি নিই নি, এই তো মাসান্তে টাকা পাঠাই, ও-পাড়ার বংশীবদন নিত্যি ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছে সে তো আমারই দোর দিয়ে দুবেলা যাতায়াত করে।

কণ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব জানি, আর দরদ দেখাতে হবে না।

চন্দর হাসি হাসি মুখে গঞ্জনা হজম করছিল আর চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এমন রূপসীশ্বর-আলো-করা-স্ত্রী তার, সোনার পুতুল ছেলে মেয়ে, প্রচুর উপার্জ্জন। তার অভাব কিসের? তার মত সুখী কে? ডাক্তার কণককে আদর করে কণকলতা বলে ডাকত। আগে আগে ছোট বেলায় কণক তাকে তমাল ঠাকুর বলে পাল্‌টা জবাব দিত, এখন মুখ ভেঙচে ভ্রূকুঁচকে চোখ ঘুরিয়ে মারতে আসে, বলে, আমার সঙ্গে ইয়ারকি কর, আমি কি তোমার—? চেয়ে চেয়ে ডাক্তার দেখছিল আর কণকের মুখের সঙ্গে আর একটি মুখের তুলনা করছিল। দুর! কিসে আর কিসে? ফুটন্ত পদ্মের সঙ্গে ঘেঁটু ফুলের তুলনা। এই ভাবে পাশ থেকে দেখলে অমন নিখুঁৎ আমদিগ'লো সুগঠন মুখখানিতে একটা কি কাঠিন্য আছে বটে, যেন কোপনা উগ্রা গর্ব্বিতা ভুবনেশ্বরী রূপ, তবু সারা অঙ্গে উপ্‌ছে-পড়া রূপ কত! সকল ভাবনার আড়ালে ডাক্তারের প্রাণ-পুরুষ লুকিয়ে চুপি চুপি বলছিল, তা' বটে, তা' সবই ঠিক। কিন্তু—

চ। কিন্তু আবার কি?

প্রা। এ জ্বলন্ত বিদ্যুৎ, সে স্নিগ্ধ মাধবী লতা; এ শোভা, সে সুখ; এ ঐশ্বর্য্য, সে আরাম। এ বৈকুণ্ঠের, সে মাটির।

ডাক্তার ছেলে মেয়েকে কোলে পিঠে করে নাচিয়ে গৃহিনীর হাতে কাঁচা আমের অম্বল শাকের ঘণ্ট খেয়ে পরের দিন কলকেতা যাত্রা করল। হাওড়া ষ্টেসনে নেমে যেন ডাক্তার বাঁচল। সেই গাড়ী ঘোড়া, প্যাসেঞ্জারের ভিড়, কুলির হাঁক ডাঁক, ঠন ঠন ঢন ঢন, মটরের ভোঁ, সব মিলে চন্দরের প্রাণে অমৃতনিষেক করে দিল। পাঁচ হপ্তা তো নয়, পাঁচ বছর সে এই পরম সুখপ্রদ হট্টগোল থেকে নির্ব্বাসিত। তার পর আজ, আঃ! কি আরাম! যেন জীবনের উঁচু নীচু কাঁকড়ে পথে গুন টেনে টেনে আজ হাত পা ছেড়ে ভরাট বিশ্রাম পেয়েছে, যেন জলের মাছ

ডাঙ্গায় তপ্ত রৌদ্রে ধড়ফড় করে আবার হঠাৎ স্নিগ্ধ শীতল অগাধ অতল জলের মাঝে সাঁতরাতে নেমেছে। আবার সেই ঘুরে ঘুরে রুগী দেখা, ছিদাম মুদীর গলির আশ পাশ দিয়ে যাতায়াত, রাত্রি জেগে বিসের আশায় শুয়ে থাকা —এ যেন বুক ভাঙা অভাবের পর সহসা বড় ইপ্সিত বস্তু লাভ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক দিন গেল, দুই দিন গেল, এক হপ্তা দু'হপ্তা করে মাস কেটে গেল। চন্দরের সাহস হল না একবার গিয়ে দেখে আসে। শ্রীহরি শ্রীহরি। ঠাকুর, তুমিই ভরসা! ডাক্তার রুগী দেখে বেড়ায়, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লেখে, নায় খায়, রাত্রে ঘোর আলগোছে ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনে আর মাঝে মাঝে বলে, রাধারমণ! পার কর। মায়ার ঠাকুর, কংসনিসূদন মধুকৈটভারি, তুমিই ভরসা।

তার পর যথারীতি একদিন ভরা নিঝুম অন্ধকার রাত্রে আবার কড়ার শব্দ হ'ল, আবার ডাক এল, বাবু গো, ওগো বাবু, বাবু—ডাক্তার চমকে এক লাফে একেবারে খাড়া! হুড়মুড় করে বাহিরে এসে চন্দর দেখল কেউ কোথায়ও নেই! তখনো কিন্তু তার কান ভরে বাজছে বুড়ী ঝির হেঁড়ে গলার ডাক। আজ আর কিছুতেই মন মানল না, কাপড় চোপড় পরে ষ্টেথস্কোপ পকেটে ডাক্তার একা বেরিয়ে পড়ল। মনের মধ্যে কে যেন বড় কাতর কণ্ঠে মিনতির সুরে বলছিল, ওগো, নীরুর আর কেউ নেই, তার একে একে সব গেছে। সে যে লতা, তোমায় ধরে তোমায় ভর করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল তুমি সরে গেলেই সে যে আছড়ে পড়ে।

ছিদাম মুদীর তের নম্বর, এই তো, এই না? যাঁ্যা, এত রাত্রে সদর দরজা খোলা! উঠানে ঘুরঘুটি অন্ধকার, টেমির আলোটুকুও নেই। উহ্! কি বাড়ী! যেন সাক্ষাৎ প্রেতপুরী, গুমোট, পিছল সিঁড়ি, হীম বাতাস, থমথমে উঠান! সেই উপরের ঘর, কে ফুঁয়ে মাদুরে পড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার সসঙ্কোচে ডাকল, নীরু। নীরু মুখ তুলে দেখল, তার পর আলুথালু কাপড় সামলে উঠে বসল, বিহ্বল করুণ চোখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, আজ এলেন? আজ পাঁচ দিন হয় বুলু আমায় ছেড়ে চলে গেছে, এখন খুকীও বুঝি যায়!

চ। য়্যাঁ! বুলু? য়্যাঁ, কি হয়েছিল, কি!

নী। সেই রোগ, সেই নীল হাত পা—

চ। য়্যাঁ, সে কি? খবর দিতে হয় গা, শ্রীহরি শ্রীহরি —আর খুকীর কি বললে?

নী! ঐ বেছ্‌নায় শুয়ে, দেখুন গে—

ডাক্তার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খুকীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। রোগপাণ্ডুর গালে বোঁজা চোখের পাতাগুলি দেখাচ্ছে যেন ঘন রং দিয়ে আঁকা, ছোট ছোট হাত পা শরীরটুকু পড়ে আছে যেন অতি হালকা আলগোছে, দেখতে দেখতে বুঝি বাতাসে মিলিয়ে যাবে। যেন এ জগতের মানুষ নয়, যেন পরীর দেশের ছোট্ট মানুষ, গায়ের রঙ যেন মরা গোধূলির, আলগা ঠোঁট দু'টি পলাশের ঝরা পাপড়ী, তার কোলে ঝকঝকে দাঁত। হাত এলিয়ে আছে, একটি বুকের ওপর, আর একটি মাথার ওধারে। চেয়ে চেয়ে দেখে ডাক্তার মুখ তুলল। কখন নিঃশব্দে নীরু এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। তার শীর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল, চোখে ব্যাকুল আতঙ্ক। চন্দর ডাকল, নীরু, খুকীকে বাঁচাতে হবে—

নী। তুমি—আপনি গেলেই এ-ও মরে যাবে।

নীরুর চোখে এমন সর্ব্বস্বখোয়ান-চাহনি। এক মুহূর্ত্তে একটা করুণার দমকা ঝড়ে কি হয়ে গেল! আমি আর যাব না গো, যাব না—বলতে না বলতে নীরু ভেঙে পড়ল; ঠিক যেমন ব্যাধ তাড়িত পাখী উড়ে এসে রক্তাক্ত পালক নিয়ে তার নীড়ে ঢোকে তেমনি করে নীরু যেন ডাক্তারের বুকের মাঝে ঢুকে এল। চন্দরও বাঁচল। এক জন সকল সত্তা দিয়ে ঘিরে নিতে ব্যাকুল, আর একজন নিজেকে নিঙড়ে দিতে ব্যাকুল। শুক্ল রাত্রি, সামনে ঘুমন্ত খুকী, এক পাশে প্রদীপের নিভ নিভ আলো, আর তার পাশে এই নীরব আত্মদান। অনেকক্ষণ পর

ডাক্তার তার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলল, এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

চ। আজই, এখনই। এখানে মরণের পথ হয়ে রয়েছে, ঐ পথে এক একটিকে টেনে নিচ্ছে। আমার বাড়ী যাবে?

সে আবার তেমনি মাথা নেড়ে সায় দিল। সে তো যেতে পেলে বাঁচে, সে যে অসহায় লতাস্বভাবা, শক্ত শাখার অবলম্বন না হ'লে তার যে মাথা তুলবার উপায় নেই। যে নীপ-তমালের মাথার উপর আলো বাতাস খেলে, সব কিছু ভুলে তাকে যে হাত বাড়িয়ে সেই দিকে ফিরতে হয়। তার যে জীবনী-শক্তির অভাব, তরল প্রাণ-ধারার জন্য যত তার ক্ষুধা। চন্দরের মুখে আজ হরি নাম এল না। কণকলতার স্মৃতি, বর্ম্মায় সেই বাঁকা সিঁথিকাটা ফুলবাবু মোহিনীমোহনের স্মৃতি, নানা জীবনা সংস্কার তার শিখা ধরে আছে। ডাক্তার হাসি হাসি মুখে শুধু দাড়িতে হাত বুলতে লাগল। নীরু তখনও তার কোলের ওপর পড়ে, এত দিনে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গী নীড় পেয়েছে। খুকী তখনও ঘুমিয়ে, তার উদ্ভিন্ন রাঙা ঠোঁটের কোলে একটু হাসি লেগে রয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিলিভিৎ। নেপাল তেরাইয়ের ছোট গাঁ। এখন চন্দর এখানকার নতুন ডাক্তার। খড়ের ছাওয়া লতায় ঢাকা বেড়ায় ঘেরা বাড়ীখানি। বাড়ীতে নীরু আর খুকী। খুকী সেরে উঠেছে। আজ দুই বৎসর হল চন্দর কলকেতা ছাড়া। নীরুকে নিজের বলে পরিচয় দিতে তাকে বাঙলা দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে। নীরুকে আমরা কি দেখেছিলাম আর এখন কি হয়েছে। এখন তার সবল সুডৌল সুস্থ শরীর, হাসি হাসি মুখ, সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের নবীন ঢল, নূতন শ্রী, যেন টলটলে রসে ভরা নধর ঘন লতার কুঞ্জটি।

নীরু চন্দরের কে? নীরুর রূপ কোথা? সে তো অতি সাদামাঠা মেয়ে, তার ওপর যখন দু'জনের প্রথম পরস্পরের কাছে আত্মবিক্রয় তখন তো নীরু গঙ্গাযাত্রার মড়া। এখনই কি তাকে সুন্দর বলা যায়? যৌবনের জ্যোৎস্নায় শ্যাম বর্ণের একটু জৌলস, একটুখানি হালকা রূপের চমক, খুব সেজেগুজে একটু টান। ডাক্তার গুণমুগ্ধ! কি গুণের ডালি মেয়ে নীরু! কুড়ের হদ্দ, অগোছাল, নিজের পরণের কাপড় সামলে চলতে জানে না। একটুখানি তিরস্কারে হাঁ করে চেয়ে নখ খোঁটে, একটুখানি আদরে বর্ত্তে গিয়ে পায়ের কেনা গোলাম, অন্যের ওপর হাঁক ডাক তর্জ্জন গর্জ্জন শুনলে ওমা, কি হবে গো!—বলে, ঘরে দোর দেয়। মেয়ের মধ্যে এ শূদ্র, জন্মদাসী, পুরুষের পায়ের জুতো, ভগবান এদের গড়েছেন দুর্ব্বলতা দিয়ে, সঙ্কোচ ভয় ও চোখের জল দিয়ে, মন্দ মারুতে থরথর কাঁপা বেতস লতাটি করে, জন্ম অপগণ্ড করে। কি পুরুষ কি মেয়ে সবারই মাঝে এ রকমটি অনেক আছে। এলোদুয়ার ঘরের মত, ছেঁচা বেড়ার জীর্ণ দেয়াল ঠেলে ঢুকলেই হ'ল, পায়ের তলায় ঘাসের ফুলের মত ফুটে থাকে, টেনে ছিঁড়লেই হ'ল। তবু এদের জোনাকীর মত আলো আছে, ঐ টুকুতেই টানে, নিজের অসহায়তার মাঝে পরম নির্ভরে সহস্র বল্লরী তন্তু মেলে পুরুষের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। দয়ার টানে পুরুষের মাঝে দেহের ক্ষুধা আসে, প্রচুর প্রাণ ঢেলে তাদের জীইয়ে তুলতে গিয়ে দেহের ডাক জেগে ওঠে, মাটীর মেয়ের টানে পরুষ আটকা পড়ে। একজনের দিয়ে আনন্দ, অন্যের নিয়ে সুখ! দেহের ক্ষুধা এরই বাহ্য অভিব্যক্তি।

কল্যাণী

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ

সন্ধ্যার পরে সতীশবাবু ছাদে শুয়ে ছিলেন। মন তাঁর ভরে' ছিল মেয়ের বিয়ের কথায়। বিকেলে তিনি পাত্র আশীর্ব্বাদ করে ফিরেচেন। সেই সম্পর্কে সহস্র খুঁটিনাটিতে তাঁর মন পূর্ণ ছিল কিন্তু সে সব কথা শুনতে স্বতই যাঁর আগ্রহ আজ তিনি কোথায়?

এই সূত্রে পরলোকগতা পত্নীর কথা তাঁর মনে পড়ছিল। কত সন্ধ্যায় এমনি ছাদে শুয়ে এই মেয়ের বিয়ের কত পরামর্শ দুজনে তাঁরা করেচেন। কত কথা কাটাকাটি হয়েচে, কত মান অভিমানের, কত হাসিকান্নার নিভৃত নীরব অভিনয় হয়ে গিয়েচে সেই ছলে। আর আজ যখন সব ঠিক হয়ে গেল তখন কি নিষ্ঠুর নীরবতা তাঁর চার পাশে গুমোট করে রয়েছে—এতটুকু ঔৎসুক্য একটা জিজ্ঞাসাও আজ তার কৌতূহলী দুটি চোখ মেলে তাঁর দিকে চেয়ে নেই!

প্রায় বছর খানেক হল সতীশবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। অপর্ণার বয়স তখন বারো। তার মায়ের ইচ্ছা মেয়ের বিয়ের আর দেরী করা না হয়। সতীশবাবু মনে করতেন আরো কিছুদিন না হ'লে মেয়ের শিক্ষা ঠিক হবে না। গৃহের কল্যাণ যার ওপর নির্ভর করবে তার সম্পর্কে কিছুই যে তাড়াতাড়ি করবার আছে সতীশবাবু তা মনে করতে পারতেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারের ভার নেবার জন্ত দূর সম্পর্কের এক বিধবা খুড়িকে সতীশ বাবু বাড়ীতে আনিয়ে ছিলেন। বিধবা তাঁর পূজার্চ্চনা নিয়েই থাকতেন, সংসারের ভার ধীরে ধীরে অপর্ণার ওপরেই গড়িয়ে পড়েছিল এবং এমন অনায়াসে সেই গুরুভার সে বহন করছিল যে, সতীশবাবু বারবার ভুলে যেতেন যে, ঘরে তাঁর গৃহিণী নেই।

মেয়ের বিয়ের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। মধ্যে একবার স্বপ্ন দেখেছেন অপর্ণার বিয়ের জন্ত গৃহিণী তাঁকে মনোযোগী হতে বলচেন।

তার পরেই সতীশবাবু পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করেন। এক আত্মীয়ের কাছে এই ছেলেটির সন্ধান তিনি পান্ এবং দেখে শুনে ভাল মনে হওয়াতে এইখানেই তিনি মেয়ের বিয়ের কথা পাকা করে ফেলেন।

যে রকম ছেলের হাতে অপর্ণাকে দেবেন তিনি ভেবেছিলেন, ছেলে ঠিক তেমন না হলেও সতীশবাবুর মনে হয়েছিল যে, অপর্ণার মা বেঁচে থাকলে এই ছেলের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে দেবার জন্ত তিনি আগ্রহ করতেন। সম্বন্ধ পাকা করবার সময়েও সতীশবাবুর মনে যে একটু দ্বিধার ভাব ছিল, ছাদে শুয়ে এই সমস্ত অতীত কথা ভাবতে ভাবতে মনের সে ভাব সতীশবাবুর আর রইল্ না, বরং স্বর্গগতা সাধ্বীর আন্তরিক ইচ্ছার অনুমতে নিজের কাজকে মানিয়ে আনতে পেরেচেন বলে' মন তাঁর ধীরে ধীরে ভরে উঠল এই মনে করে যে, অপর্ণা তার মায়ের আশীর্ব্বাদ পাবে এই বিয়েতে।

অপর্ণা ডাকল—বাবা।

সতীশবাবু সাড়া দিতে চেষ্টা করচেন কিন্তু তাঁর গলা ভারি হয়ে এসেছিল, আওয়াজ বেরুল না।

অপর্ণা আবার বলল—নন্টু ত এখনো বাড়ী ফিরল না বাবা!

ইতিমধ্যে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সতীশবাবু বললেন—এখনো ফেরে নি? কত রাত হয়েছে?—বলে কৈফিয়তের ভাবে বললেন—একটু তন্দ্রা এসেছিল আমার।

রাত অনেক হয়েচে—সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে।

অত রাত হয়েচে!

আগে গিয়ে মধুয়াকে পাঠিয়েছিলাম নরুকে খুঁজতে, সে ফিরে এসে বলল কোথাও পেল-না।

আচ্ছা আমি দেখচি—বলে সতীশবাবু উঠছিলেন, এমন সময় নীচে থেকে নরু সাড়া দিল—কই এখানে আলো নেই কেন দিদি—আলসের ওপর ঝুঁকে অপর্ণা হেঁকে বলল, ওপরে এস একবার নরু—বাবা ডাকচেন।

নরু এসে দাঁড়াতে শাসনের সুরে দিদি তারে জিজ্ঞাসা করলেন—এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে তুমি?

অন্ধকার থেকে একেবারে তীব্র আলোকের মধ্যে এসে নরু প্রথমটা যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু দিদির কথা শেষ হতে না হতে নিজের সে ভাবটা সামলে নিয়ে সে বলল—হরির লুট দিতে।

সতীশবাবু প্রশ্ন করলেন—কেন হরির লুট কেন?

মা যে বলেছিলেন, যেদিন দিদির বিয়ের ঠিক হবে সেদিন হরির লুট দেবেন।

এ কথায় ওপর কেউ কোন কথা বলল না দেখে নরু দিদিকে বলল—বাতাসাগুলো রাখ দিদি—বলে কোঁচার খুটে বাঁধা পুঁটুলিটি দিদির দিকে আগিয়ে দিল।

মধুয়া নীচে থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল—দিদি খাবারের জায়গা করব? খোকাবাবু ত এখনো আসে নি—ঠাকুমা কিন্তু বললেন।

এই ত আমি এসেচি—

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কত খুঁজে এলাম আমি আলো নিয়ে।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল—বাবা, খাবার জায়গা করবে?

হাঁ কর, আমি যাচ্ছি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাসিয়াদের গাথা। ছেলে চলে গেছে; মা তাই, গান গেয়ে ছেলেকে পথের কথা বলে দেয়। সুদূর পথ। মা ভাবে, ছেলে তার এত পথ যাবে কেমন করে? বিচ্ছেদের আবেগ গান হ'য়ে বের হয় মায়ের বুক ফেটে। এমনি ধারা গান, যে-মায়ের ঘর উজোর হয়ে যায়, তারই কণ্ঠে কান্নার সুরে ফুটে ওঠে। মায়ের মায়া তাই মরণের পথটি ধরে এই গানের রূপে ছেলেকে পথের সন্ধান ব'লে দেয়।

চেনা ঠাকুরের থান্‌টি খাসা
ভুগী পেরেতের ওই সে বাসা
ওখানে বাপা বৈসে থেও
কাজলা পাখি জিরিয়ে যেও!

চিকোমান পাহাড়ে ছৈ বাঁধিবা
চলমান নদীজল তুইলা পিবা।
পেরেত ওহানে ভাত রেঁধে খায়,
ভূতের রাজা কল্‌কি ধরায়!
আগুনী জ্বালায়ো চকমকি ঘষে,
বোসো ডাক গাছে ষাঁড় বেঁধে ক'সে।

বাটে নেওয়াং মানুষ-খেকো,
তে-মাথায় ফেরে তে-শিরে দেখো।
নোয়ার তাগা তাদের দিও,
ঝুঁটির পালক ফেলে পালিও।
মরুক্কা দেখে করে দাপট্‌,
নোয়া ফেল্লেই দেয় চম্পট!
দাঁত খামাটি বন্ধ করে
মোরগ ঝুঁটি দেখ্‌লে পরে!

তিকোণশিরের বাপ্‌টা নেওয়াং,
রিকুচিবিনের বাপ্‌টা নেওয়াং,
বাট্‌ আগলায় ভূতের দেওয়ান্‌
বুঝে চলো রে বাপ, ওরে আমার বাপ!

বাপা ছিল রক্ষে কবজ,
  বাপা ছিল মাথার ছাতি,
বাপ কি ব্যাটা ছাওয়াল আমার
  ঠাকুরদাদার জোয়ান নাতি!
বোলন গাছের শক্ত ডালি, শালগাছের কচা,
  ছিলেন আমার বাছা!
শিলে না হেলেন ঝড়ে না এ্যালেন যে,
কোন্ দানা সে ভাঙ্‌লো তারে রে।
কে সে জোরোয়ার?

রুগ্‌নি কে সে ডাইনি বুড়ি কর্‌লে
  হাড্ডি সার।

পরাণ পাখি কে কাড়িল মুই দেখিলাম না,
নতুন পাতায় বৌট ভাঙিল মুই জানিলাম না!

কচি পাতার মঞ্জরীটি ধর্‌লো ডালের আগে
তার পানেতে শতেক শতে দানোর দৃষ্টি লাগে,
মুস্‌ড়ে খেলো পাতা, মুচড়ে গেল ডাল
পরাণ পাখি উড়িয়ে দিল বিঁধ্‌লো বুকে শাল।

কাটারী দিয়া কাট্‌লো না
ছুরির ঘায়ে কাট্‌লো!
পরাণ লতা কাট্‌লো রে
উপ্‌ড়ে ভুঁয়ে পড়্‌লো!
রোদে পোড়া মাঠের গাছ
ছাঁওয়া করেই ছিলে,
স্রোতের বুকে অচল পাথর
ছাওয়াল আমার ছিলে,
বাছুনীরে ছিলে!
বাছুরী-হারা মা ফিরে চাই
আপন ছাঁওয়ায় ছাওয়াল না পাই,
মুখ ফেরাই ঘড়ি ঘড়ি
পাই না যে আদর করি!
মুই যে তোমার মা
ভুলে সে কথা!
তুই যে আমায় ছা'
লাগ্‌ছে না ব্যথা?
কথা ক' উঠে বোস্‌,
অমন ক'রে কেন রোস্‌?

নিদ্‌ এল কি তাড়াতাড়ি
গা হল কি তাইতে ভারি?
চোখের পাতা পড়্‌ল ঢুলে
ঘুম পেল কি দিনদুপুরে?
মৌনী শাকের শিকর কেটে
কে খাওয়ালে শিলে বেটে,
ঘুম পাড়ানি ঘুম্‌চি পাতা
তাই কি খেলো, সকল গা'টা
ঘুমের ঘোরে এলিয়ে এলো?
গা তোল রে, গা তোল!

গইল্‌ ছাড়া বইল আমার,
বিদেশ বিভুঁই যেও না,
নেংবা নদীর বিজন পারে
একলা চ'রে খেও না,
চিকমাং পাহাড় ভেঙে গেলেন তোমার পিতা
বলমাং নদী পাড়ে গেলেন তোমার মিতা
ওই পথ ধরিয়ো বাপা
দেখেশুনে চলিও।
হাসি মুখে যাইয়ো বাপা
মনোসুখে চলিও!

আমি হবো দেশান্তরি, যাবো হয়ে একেশ্বরী
মুখ আর তুল্‌বো না, চোখ আর মেলবো না,
দেশান্তরী, একেশ্বরী!

বেদে

(আহ্লাদি)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ন' পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভালো লাগ্‌ল।

জীবনারম্ভের সেই প্রথম ভালো-লাগাটি আজ্‌কের বিষণ্ণ অপরাহ্নে ঠিক ধর্‌তে পারছি না। সেটা ভৈরবী না ভূপালির সুর তাও বা কে বল্‌বে ?

—কাদায় পড়ে' গিয়েছিলে বুঝি ?

আমি কথা বল্‌তে পারছিলাম না। কাঁদ্‌ছিলাম!

—ইস্? কপাল কেটে যে রক্ত বেরিয়েছে।

চারটি আঙুল আমার কপালে এসে লাগ্‌ল। দেখ্‌লাম তার চারটি আঙুলের ডগা রক্তে টুক্‌টুক্ কর্‌ছে। কোমরে কাপড় জড়ানো একটি ছেলে, খালি গা, হাঁটু পর্য্যন্ত, ধূলো,—এসে বল্লে—তোকে মাষ্টার মশায় ডাক্‌ছে আহ্লাদি।

—কেন রে ? বল্‌গে আমি পার্‌ব না এখন উঠোন লেপ্‌তে। বাম্‌নি উনুনে আগুন দিক্।

পাশের দেবদারু গাছটায় কচি পাতার জন্মোৎসব চলেছে। ভোরের বাতাস ঝির্ ঝির্ কর্‌ছিল।

ছেলেটি বল্লে—আমি ফিরে গিয়ে যদি বলি যে আহ্লাদি আসবে না, আমার পিঠেই ত' বেত ভাঙ্‌বে। তোকে ত' আর ছোঁবে না। কিন্তু উঠোন লেপ্‌তে তোকে ডাকে নি। বাম্‌নিই লেপ্‌ছে।

আহ্লাদি ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—আমি এখুনি আস্‌ছি ভাই...।

ছেলেটি আমার হাত ধ'রে ফেল্লে। বল্লে—বড্ড লেগেছে বুঝি ? কেমন করে' লাগ্‌ল ?

—গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির কোণায় লেগে। পিছ্‌লে পড়ে গেছ্‌লাম।

—কল্‌কাতায় এই বুঝি প্রথম এসেছিস ? বাড়ী থেকে পালিয়ে, না পথ ভুলে ?

আহ্লাদি ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল। তার হাতে একটা গেরুয়া রঙের কাপড়। সে তার ছোট্ট তর্জ্জনীটি হেলিয়ে বল্লে—এবার তুমি যাও, মাষ্টার মশাইর কাছে; বসন্ত বলে' দিয়েছে তুমি কাল লুকিয়ে মাষ্টার মশাইর হুঁকোতে টান মেরেছ। মাষ্টার মশাই তাঁর পায়ের খড়ম উঁচিয়ে বসে' আছেন, নটুরুর পিঠ ভাঙ্‌বেন তবে হুঁকোয় টান দেবেন। যাও এবার!

নটরু তার কোমরে কাপড়টা আরো একটু কষে' বেঁধে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌ল।—বসন্ত বলুক দেখি ত' আমার মুখের ওপর! ছোঁচোর কোথাকার! দেব থাব্‌ড়া মেরে শূয়োরের মুখ ভেঙে। আমি হুঁকো কোথায়, তাই জানি না। যাবই ত' মাষ্টারের কাছে। আমি কেয়ার

করি কি না। কিন্তু আগে বসন্তর দাঁত বত্রিশটা খেঁৎলে না দিলেই নয়।

আহ্লাদি তার হাতটা চেপে ধ'রে বল্লে—সকালবেলাই মারামারি করতে ছুটিস্ নি নট্রু!

আহ্লাদির মুঠি ভারি কোমল কিন্তু। নট্রু তাতে বাঁধা পড়ে না।

আমার হাত ধ'রে সে বল্লে—এস ভাই···

প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, ছায়া পড়েছে। মা'র কোলের মত! একটা ডোবা, ঘাট বাঁধানো নয়, পানীয় জল নীল্‌চে হয়ে এসেছে, কল্‌মী লতা ভাস্‌ছে, দুটো হাঁস পাঁক খুঁড়্‌ছে।

আহ্লাদি আমার কপালে জল দিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

—এখানে কি করে এলে ভাই?

—মামার সঙ্গে কল্‌কাতায় আজ ভোরেই পৌঁছেছি...

—মামা? তিনি কোথায়?

—তিনি আমাকে গঙ্গার ঘাটে ফেলে রেখে কোথায় যে চলে গেলেন, পাত্তা পেলাম না।

ছেলেরা নাম্‌তা মুখস্ত করছে। বেতের আওয়াজ আর আর্ত্তধ্বনিও কানে ভেসে আস্‌ছিল।

—তাঁর নাম কি? কোথায় তোমাদের গাঁ?

—তা বলব না! আমি সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না।

—কেন ভাই?

আমার চোখে জল এসে পড়েছিল।

—আমাকে ওরা মারে। মামী একদিন আমাকে একটা বঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল। পিঠের কাপড়টা তুলে দেখালাম। আহ্লাদি আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়্‌ল দুই হাত রেখে। তার দুটি হাতই ভিজা। তার চুলগুলিও খোঁপায় জড়ান ছিল না।

আহ্লাদির তখন কত বয়সই বা হবে? এগারোর বেশী?

—কিন্তু মামা যদি একদিন নিতে আসে?

—তা হলে বুঝি লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ের মধ্যে হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়?

—মাষ্টার মশাই যদি তোমাকে বাড়ীতে রেখে দিয়ে আসেন?

—তিনি যখন গঙ্গাস্নান করে' ফির্‌ছিলেন, আমাকে কাঁদ্‌তে দেখে ডেকে নিলেন সঙ্গে। তাঁকে সব বলেছি, তিনি আমাকে এখানে রাখ্‌বেন বলেছেন!

—সত্যি? আহ্লাদির দুটী চোখ ছেপে, খুসি উছ্‌লে উঠেছে।—বেশ হবে কিন্তু তা হলে? তোমার নাম কি ভাই?

—পচা।

—ধোৎ! আহ্লাদি ভুরু কুঁচ্‌কেছে।—তোমার নাম কাঁচা। এই নাও, ভিজা কাপড়টা ছেড়ে, এই আলখাল্লাটা পর।

কাপড়টার রং গেরুয়া।

মাষ্টার মশায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এটাকে ইস্কুল না বলে' আস্তাবল বল্‌তে কারু বাধ্‌বে না হয় ত।

নট্রু মাষ্টারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি চাইল।

—না।

—থাকতে পারছি না স্যর্, কল্ড বাই নেচার...

—পাজী, নচ্ছার ..মাষ্টার মেহেদির ভাঙা ডাল দিয়ে নট্রুর ঘাড়ের ওপর সপাং করলে। কিন্তু নট্রু প্রকৃতির আহ্বান অবহেলা করতে শেখে নি—আর যায় কোথা! সমস্ত ইস্কুল ঘরে যেন আগুন লেগে গেছে। নট্রুর নাক কেটে রক্ত বা'র হয়ে গেছে, তবু মাষ্টার ক্ষান্ত হয় না।

নট্রুকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সে দুই হাতে চোখের জল কানের দিকে ঠেলে দিয়ে বইর আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভেঙ্‌চে নিচ্ছে। আহ্লাদি গোলমাল শুনে দরজা পর্য্যন্ত এসেছিল। নট্রুর মুখ-ভেঙ্‌চান দেখে মুচ্‌কে একটু হেসে গেল। নট্রু কি ওর হাসিকেও ভেঙ্‌চায়?

—লেখা পড়া কিছু জানিস্, না একেবারে স্বরে-অ ?'

—গাঁয়ের ইস্কুলের সিক্স্থ্ ক্লাশ সারা হয়েছে, এবার···

—বেশ অঙ্ক কদ্দূর ?

—জি সি এম্।

সব ছেলেগুলি হাঁ হয়ে গেছে দেখ্ছি। নটরুর মুখে ইংরিজিটা তা হলে নিতান্ত অকেজো তুচ্ছ। ওটা ওদের বুলি শেখানো হয়েছে। কেন না একটি পাঁচ বছরের ছেলে মুখখানি কাঁচুমাচু করে এসে বল্লে—আই এম্ ক'ল্ বাই নেচি স্ৰুল্! নট্রু ত' হেসেই খুন!

আমাকে একটা ভাগ দিয়ে বল্লে—পাঁচ মিনিটে···

তু মিনিট্ বেশী লেগে গেল বুঝি। মাষ্টার ত' সপাং করে' বেতের বাড়ি মেরে দিল। অঙ্কটা শুদ্ধ্ হয়েছিল কিন্তু। তাতে কি যায় আসে? ডিসিপ্লিন্! ছেলেগুলো কিন্তু গুণও জানে না।

গঙ্গার ধারে যে লোকটি আমার হাত ধরেছিল তার তুটি উদাস চোখের করুণা দেখেছিলাম, এখন দেখি যে লোকটির মুখে বসন্তের দাগ, নাকের নীচে প্রকাণ্ড একটা ঘা হয়ে শুকিয়ে গিয়ে কদর্য্য একটা দাগ হয়ে আছে।

কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে বেঞ্চি। আশ্রমের কর্ত্তা যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে না ব'লে এখনো কিছুই তৈরী হল না এ কথা মাষ্টার এরই মধ্যে বার পাঁচ সাত উল্লেখ করলে। সেটাকে বোর্ড বলা চলে না। তক্তা। একটা অঙ্ক লিখ্তে লিখ্তে মাষ্টার বল্তে লাগ্লেন—অনাথ আশ্রমটা যেন দেশোদ্ধারের তালিকায় কিছুই না। ভোট্ কুড়োবার বেলায় হাজারে হাজারে, আর বেচারা ইস্কুলটার বোর্ডে আল্কাতরা পড়ে না...

একটা যোগ অঙ্ক লিখ্তে না লিখ্তেই মাষ্টার হেঁকে উঠ্ল—সাত মিনিট্···

সমস্ত ছেলে চঞ্চল হয়ে উঠ্ল। আমাকে মাষ্টার একটা ভাঙা স্লেট্ আর কড়ে আঙুলের আধখানা একটা পেন্সিল দিলে। টপাটপ্ অঙ্কটা কষে ফেল্লুম একেবারে।

আমাকে স্লেটটা মাষ্টারের হাতের কাছে বাড়িয়ে দিতে দেখেই সব ছেলেগুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠ্ল। অঙ্ক যে করে' হোক্ শেষ করে' সব একেবারে ভিড় করে' এসে দাঁড়াল। নট্রু কিন্তু দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে তেম্নিই দাঁড়িয়ে আছে। নির্ব্বিকার!

শুধু আমার অঙ্কটাই রাইট্ হয়েছে। মাষ্টার আর সবাইকে ঠেলে দিল। ছেলেগুলি যে যার জায়গায় গিয়ে হাত মেলে দাঁড়িয়েছে। কেন রে? মাষ্টার বেতটাকে শূন্যে তুবার বিহার্সাল দিইয়ে নিয়ে গুণে গুণে ছেলেগুলির কচি কচি হাতে পাঁচ সাত নয় বারো যেমন খুসি সপাং করতে লাগ্ল। নট্রুর কাছে এসে হাঁক্লে—তেইশ!

নট্রু চেঁচিয়ে উঠ্ল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কি করে হয়?

মাষ্টারের কথার নড়চড় হয় নি। একটি একটি করে' তু কুড়ি তিন হল' ত' হল। মারাই ত' মাষ্টারের পেশা।

আমার অঙ্ক রাইট্ হওয়াটা প্রকাণ্ড অপরাধের মতো মনে হচ্ছিল।

ইস্কুল ভেঙে গেল।

রোজ এম্নি করেই ভাঙে। মাষ্টারের হাতের ও জিভের ব্যায়াম হয় খুব, আর নট্রুর মাড়ির আর দাঁতের।

অশ্বত্থের পাতায় রোদ পিছলে পড়ে—ছেলেরা স্লেট খাতা বগলে নিয়ে বানের জলের মত—বেরিয়ে আসে। আটটায় ইস্কুল শেষ ক'রে এবার আমাদের মাটি কোপাবার পালা। এটা আশ্রমকর্ত্তার ইস্কুল-পরিচালনার নতুন রুটিন্।

ছেলেরা খাপ্রার ঘরে তাদের ছেঁড়া খাতা বই ছড়িয়ে রেখে এসে কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়্তে লেগে যায়। নট্রু এখানে 'ফাষ্ট বয়'। আমার হাতে একটা কোদাল দিয়ে বল্লে—কোপা!

মাটির গন্ধে বুক ভ'রে আসে। হাঁটু পর্য্যন্ত মাটি, মাথায় মাটি, মুখে মাটি,—যেন এতগুলি ছেলের কোন্ একটি মা, তাঁর স্নেহ সেটে দিচ্ছেন। মাষ্টার একটা দেবদারুর চারা-গাছের তলায় ব'সে দেখে আর হুকুম করে। মাঝে মাঝে আহ্লাদি ছুটে এসে ছুটে চ'লে

যায়। যেন গেরুয়া মাটির দেশে তরতর করে' একটি রজত-লেখা নদী বয়ে গেল।

গঙ্গা গাং নয়—খাল তখন তা শিটিয়ে এসেছে।

নটরু ছেলের দলের পাণ্ডা হয়ে গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে আসে। মাষ্টার সাঁইত্রিশ মিনিট্ কবুল করে' দেয়—অথচ লোহার ঘড়িটে নিজের ট্যাকেই থাকে। আমাদের সাঁইত্রিশ মিনিট্ তাই সাতান্নতে গিয়ে ঠেকে। ভাত খাবার আগে পেট্ ভরে' আর একবার মা'র খেয়ে নিই।

নটরু ট্যাক থেকে বিড়ি আর দেশ্‌লাই বা'র করলে।—খাবি?

মতামত দেবার আগেই নটরু ধরিয়ে ধোঁয়া দিতে সুরু করেছে। কৌতূহল যে হচ্ছিল না তা নয়। বল্লাম—মাষ্টারকে যদি ওরা বলে' দেয়...

নটরু একগাল হেসে বল্লে—তোরা বলে' দিবি নাকি রে বসন্ত?

—পাগল! কোনদিন বলেছি?

বল্লাম—তুই যে মাষ্টারের হুঁকোয় টান দিয়েছিলি সে কথা ত বসন্তই বলে' দিয়েছিল! আহ্লাদি বল্লে।

—আহ্লাদি বল্লে? বসন্ত রুখে উঠেছে।—ছুঁড়ি ভারি মিথ্যুক ত'! হাঁরে, বলেছি নটরু? তা হলে আমারই কি দাঁত ক'টা আস্ত থাকত?

বল্লাম—না না, আহ্লাদি মিথ্যে বলে নি, ঠাট্টা করেছে...

বিঁড়িতে টান দিতে হল বৈ কি! কিন্তু পাঁজরা দু'খানা খসে' পড়্‌তে চাইল। বসন্তটা হেসে লুটোপুটি করছে। লজ্জা ঢাক্‌তে গিয়ে আমিও হাস্‌ছি, আরো টান্‌ছি, আরো পাঁজরা চিমটে যাচ্ছে। বিঁড়িটা নিবে গেল। যেন বাঁচলুম।

নদীর পাড় বেশ ঢালু। পলি মাটির কোমল কাদায় সমস্তটা পাড় পিছল হয়ে নেমেছে। ছেলেগুলি পাড়ের ধারে বসে হাত ছেড়ে দিয়ে হুর্‌হুর্ করতে করতে জলের মধ্যে এসে পড়্‌ছে। বেজায় ফুর্ত্তি। নটরুর পর্য্যন্ত। ঐ করছে, আর একহাঁটু জলের মধ্যে খল্‌বল্ করছে। ওরা সাঁতার জানে না। তবু নটরুই ওদের পাণ্ডা!

সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে মনে হল আহ্লাদি এলে বেশ হত! কত মেয়েরাই ত' আস্‌ছে, নাইছে, চুল ধুচ্ছে, গাল ফুলিয়ে জল কুল্‌কুচো করছে। মাষ্টার না আসে—না আসুক! কিন্তু আহ্লাদি যদি আস্‌ত, আমি ডুব সাঁতার দিয়ে ওর পা ছুঁয়ে যেতুম। ছুঁয়েই সাঁতরে—হোই দূরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তুম। ও ভাব্‌ত মাছে ঠোকা দিয়ে পালিয়েছে বুঝি।

আহ্লাদি আসে না।

—এবার ফিরে চল্ নটরু। দেরি হয়ে যাবে।

নটরু কেয়ার করে না। বলে—দেরি না হলেও বরাতে মার আছেই আছে। মাষ্টারের ট্যাক থেকে ঘড়ি আর কে ছিনিয়ে দেখ্‌তে যাচ্ছে? ঘড়ি দেখ্‌তে জানিস্ তুই?

হারান বল্লে—ঘড়ি আজ তিন দিন বন্ধ। যাট্ গুণে গুণে ওর মিনিট্।

মারকে ওরা ডরায় না। ওটা ওদের দৈনন্দিন বরাদ্দের মত। নটরু তার দল নিয়ে পাড় বেয়ে বেয়ে জলে ঝাঁপাতেই থাকে। পাল্লা দেয়—লাইন বাঁধে—যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে; নদীটা ওদের বিপক্ষ, ওকে এক সঙ্গে আক্রমণ করা হচ্ছে—এম্‌নি।

আমি উঠে আসি। আহ্লাদি হয় ত সেই ডোবাটায় গা ডোবায়। ঈস্!

ডিম-ওলা ট্যাংরা মাছটা আমার পাতে পড়তেই নটরু খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভাব্‌লাম, ঠাট্টা করছে বুঝি।

আহ্লাদি মাছের বাসনটা হাত থেকে মাটিতে নাবিয়ে শুধোল—কি হ'ল রে নটরু?

বল্লাম—ডিমটা চাস্, না খালি মাছটা?

আহ্লাদি হেসে উঠ্‌ল। নটরুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

—নে নে গোটা মাছটাই নে।

পাত থেকে মাছটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নটুরু বল্লে—তোর পাতেরটা আমি খাই কি না।

ছুটে যাচ্ছিল, আহ্লাদি তার হাত ফের ধরে' ফেল্লে।

—ছাড়্, আমার ক্ষিদে নেই আহ্লাদি।

আমরা এঁটো কুড়িয়ে পাতাগুলি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসি। আহ্লাদি গোবর দিয়ে মাটি লেপে, কোমরে কাপড় জড়ায়।

তারপর আমাদের দু' তিন ঘণ্টা ছুটি। যা খুসি তাই করি। যার খুসি ডাংগুলি, যার খুসি গাব্দু গুলি, যার খুসি দোল্না-দোল্না।

গত রাতের বৃষ্টিতে কাঁচা পেয়ারাগুলি বুঝি ডাঁসিয়েছে।

নটুরু আগ্ডালেতে চড়ে' বেছে বেছে পেয়ারা নীচে আহ্লাদির ছোট্ট কোঁচড়টিতে ছুঁড়ে মার্ছে। ওর কোঁচড় ভরে' গেল।

—আমায় একটা দিবি রে নটুরু? বলে' তলায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ নটুরুর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল। একাদিক্রমে তিন চারটে পেয়ারা আহ্লাদির কোঁচড়ে না পড়ে' একেবারে আমার কপালে মাথায় এসে লাগ্তে লাগ্ল।

তার হাতের টিপ-এর এ হেন ভুল দেখে আহ্লাদি ব্যস্ত হয়ে আমার মাথাটা দু' হাতে ধরে' ফেলে বুকের কাছে টেনে এনে বল্লে—ওকি, ওকে মার্ছিস্ যে? কোঁচড়ের আশ্রিত সমস্তগুলি পেয়ারাই কিন্তু তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

নটুরু একেবারে তর্তর্ করে' নেমে এল।

—তুই আমার সব পেয়ারা মাটিতে ফেলে দিলি যে! বলেই আহ্লাদির গালে সাঁ করে' এক চড়।

ন' বছরের কাঁচা মাংসে পাত্লা রক্ত টগ্বগ্ করে' উঠ্ল বুঝি। ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

পেয়ারা আমাদের কামানের গোলা, মরা ডাল আমাদের বন্দুক আর সঙীন আর তলোয়ার—।

যুদ্ধে হেরে যাই। পুরোনো ঘায়ে আঁচড় লেগে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছোটে। আহ্লাদির চোখে জল, তবু গাঁদার পাতা থেঁৎলে ঘায়ের মুখে চেপে ধর্ছে আমার।

নটুরু কোমরে কাপড়টা কষে' বাঁধতে বাঁধ্তে বল্লে—মাষ্টারকে যদি বলিস্ যে মেরেছি, তা'লে তোর নাকটা চেপ্টে দেব। বলে' রাখ্ছি আহ্লাদি।

আহ্লাদি মাষ্টারকে বলে না বটে!

দুপুরের ইস্কুল জমে না কোন দিন। মাষ্টার হুঁকো নিয়ে আসে; ঝিমোয়। বেত মারার উৎসাহ তখন মিইয়ে আসে, অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে শুধু চিম্টি, কি বড় জোর পা বাড়িয়ে বেঞ্চির তলা দিয়ে লাথি। ছেলেদের কড়া-কিয়া বল্তে হুকুম দেয়। ছেলেরা কলরব করে। মাষ্টারের তাতে ঘুম আসে। হুঁকোর জলন্ত কল্কেটা কোলের ওপর পড়ে' যায় হয় ত। মাষ্টার বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলেরা হাসে। মাষ্টার একজনকে মেহেদীর ডাল ভেঙে আন্তে বলে। তার পিঠে আগে পঁচিশ ঘা মেরে মাষ্টারের বউনি হয়। যেদিন ক'ল্কে পড়ে না, সে দিনটা নিশ্চিন্তে কাটে। নটুরু কতদিন আল্গোছে কল্কেটা হুঁকোর মুখ থেকে তুলে সরিয়ে রেখেছে। নিমগাছের ছায়া ছড়িয়ে পড়্তেই বুঝি যে চারটে বেজেছে। একসঙ্গে আমরা দুপ্দাপ করে' উঠি। মাষ্টারের ঘুম ভেঙে যায়। ট্যাঁকের ঘড়িটা লুকিয়ে একবার দেখে ছুটি দিয়ে দেয়। পরে ফের জিগ্-গেস করে—নিমগাছের ছায়া পড়েছে ত' রে? বলে' জান্লার দিকে এগিয়ে আসে।

বিকেলে যেদিন ভিক্ষার মিছিল নিয়ে বেরুতে না হয় সেদিন ফের মাটি কোপাই। বেগুনের চারাগুলি মাটির অবগুণ্ঠন খুলে আকাশকে একটুখানি দেখে নিচ্ছে। মিছিলে—এবারো আহ্লাদি আসে না, ঘর নিকোয় ঝাট দেয়, মাষ্টারের হুঁকোতে তামাক সাজে।

মাথার ঘা তখনো টন্টন্ করলে কি হবে, নটুরুর সঙ্গে ভাব করে ফেল্লাম ফের। খালি চ্যাটাইটার ওপর শুয়ে

লাগ্‌ছিল। নটরু তার বিছানায় নিশ্চয়ই ভাগ দিত না। কেই বা চায়? আমারো বিছানা আস্‌বে দু' একদিনেরি মধ্যে—মাষ্টার ত' বল্লে।

—চিড়িয়াখানা দেখিস্ নি?

—কি করে' দেখ্‌ব? দেখাবি?

—ওরে বাবা, পঞ্চাশটা হাতি বাহাত্তরটা গণ্ডারের সঙ্গে শুঁড় দিয়ে লড়ে।

—কটার ভাগে কটা করে' পড়ে তাহলে?

—তা কে জানে? সিংহগুলো সার বেঁধে দাঁড়ায়, বন মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ভীষণ জায়গা। ঢুকতে মোটে সাত পয়সা। আছে তোর কাছে?

—আহ্লাদি যে বল্‌লে এক আনা করে' লোকপিছু, বাকী তিন পয়সার বিড়ি কিন্‌বি বুঝি?

নটরু চটে উঠেছে।—আহ্লাদি ত' সবই জানে; রাস্তাই চেনে না,—এক আনা! হেঁঃ!

বেড়ার একটা দিক মেরামত সারা হয় নি এখনো। অশ্বত্থ গাছের গোড়া থেকে আগাগোড়া অন্ধকারে আমাদের ঘর ভরা।

বল্লাম—আহ্লাদি এখানে কি করে' এল রে?

—কে জানে? আহ্লাদিকেই শুধোস্!

—এতগুলো ছেলের মধ্যে ও কোত্থেকে ভেসে এল,—ষোলঘরের নাম্‌তা পড়্‌তে পড়্‌তে ও যেন হঠাৎ একঘরের নাম্‌তা—ভারি সোজা।—ঘুমুচ্ছিস্ নটরু?

নটরু পাশ ফিরেছে।—মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলে ও খবর পেতে পারিস্।

—তার মানে মাথার ঘা'টা আর না শুকোক এই তোর ইচ্ছা!

—রাখ্, ঘুমো। রাত ঢের হল। সাঁঝের তারাটা কতদূর উঠে এসেছে দেখেছিস্?

নন্তটা বেজায় কাশ্‌ছে। একবার এ-পাশ আরবার ও-পাশ। খুক্‌খুক্ খুক্‌খুক্—ঠায় শুতে পাচ্ছে না। বালিশটায় মাথা গুঁজে হামাগুড়ি দেবার মতন করে' একটু শু'ল।

—ওর কি হল? নন্তুর

—হাঁপানী। রোজ কাশে। বেচারা ঘুমুতে পারে না চোখ ভরে' কোন রাতে। কিন্তু গা-সওয়া!

—না হে, দেখ্‌ছিস না কেমন হাঁসফাঁস কর্‌ছে।

—থাক্, আমাকে ঘুমুতে দে বল্‌ছি। আর বক্‌বক্ কর্‌লে মুখে থুতু দেব।

নটরুটা একটুতেই চটে।

নিঝুম। চোখ বুঁজে পড়ে' ছিলাম হাতের ওপর মাথা রেখে। হঠাৎ যেন কে এল। চোখ চেয়ে দেখি—আহ্লাদি।

—চ্যাটাইয়ে শুয়ে ঘুম আস্‌ছে না, না রে?

—আস্‌বে'খন।

এই আমার বালিশটা নে। পর্শু থেকেই কাঁথা পাবি।

আহ্লাদি আমার মাথাটা দুটি হাতে তুলে বালিশটা ঘাড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে চলে' গেল।

বালিশটায় সোঁদাল গন্ধ ভুর্‌ভুর্ কর্‌ছে। মামা এক দিন আমাকে দু'হাত কড়িকাঠে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল, মামীর বটির দাগ আজো মেরুদণ্ডের কাছে ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম মাথায় আমার এর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্বালা কর্‌ছিল।

সকালবেলা চেয়ে দেখি বালিশটা আশ্চর্য্যরকম স্থান পরিবর্ত্তন করেছে কিন্তু। আমার ঘাড়ের তলা থেকে একেবারে কখন যে নটরুর বুকের তলায় গিয়ে পৌচেছে আবিষ্কার করা কঠিন। তাড়াতাড়ি ধ'ড়্‌মড় করে' উঠে বস্‌লাম। ভোরবেলাকার ঘুমে মানুষকে কী সুন্দর দেখায় সে দিন নটরুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছিলাম। সে দিন নটরুর আর ঘুম ভাঙি নি।

আমাতে বসন্তুতে দারুণ খোঁজাখুঁজি। সুতোয় মাঞ্জা হল, লাটাই এল, ঘুড়ি তৈরী—নটরু নেই। পিটালি গাছের তলায় নটরু বসে'। এগিয়ে গিয়ে দেখি পা ছড়িয়ে বসে সে পুঁতির মালা গাঁথ্‌ছে।

—কিরে, ঘুড়ি ওড়াবি আয়।

আজ আর নয় ভাই, কাজ আছে।

হাসি পায়, নটরুর কাজ! বসন্ত পুঁতিগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বল্লে—ঘোড়ার ডিম।

নটরু সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই বসন্তর পেটে এক লাথি। —শীগ্‌গির গুছিয়ে দে বল্‌ছি নইলে পিলে ফাঁক করে' দেব, রাস্কেল।

বসন্ত গুছিয়ে দিলে। নটরু ফের পা ছড়িয়ে মালা গাঁথ্‌তে বস্‌ল। অথচ কাল সারা দুপুরের ছুটিতে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে কত তোড়-জোড়। চড়ক পুকুরের ছোঁড়াদের ঘুড়ি শুধু কাট্‌বে না, লট্‌কাবে।

—পুঁতি কোত্থেকে জোগাড় কর্‌ল রে বসন্ত? কিন্‌ল?

—হাঁ।

—বসন্তর খুব লেগেছে।

—পয়সা কোথায় পেল? জানিস্?

—তোকে বল্‌ব, কিন্তু ওকে বলিস্ নি, খবরদার। বল্‌বি না ত?

—কক্ষনো না, কক্ষনো না।

—বল্‌লে এবার তা'লে পাঁজরা চুর হবে ভাই! শুন্‌বি কি ক'রে পয়সা পেল? পর্শু মিছিল করে' যাবার সময়—তুই, মাষ্টার সব এগিয়ে ছিলি—একটা অন্ধ ভিখিরী লোহার পুলটির কাছে বসে' ভিক্ষা কর্‌ছিল। পাশে তার একটা টিনের বাটি—বাটিটা নটরু খপ্ করে' তুলে নিয়ে পয়সাগুলি মুঠিতে চেপে বাটিটা ড্রেনে ছুঁড়ে দিলে; সাত আনা—আটাশটা পয়সা ভাই। বল্লাম—এক পয়সার ঝাল্‌চানা কিনে দে নটরু। দিলে না। ঐ আটাশটা পয়সা দিয়েই পুঁতি কিন্‌লে।

—পুঁতি? কি করবে ও দিয়ে?

—কে জানে?

সন্ধ্যার দিকে সবাই জান্‌লাম। সে পুঁতির মালা আহ্লাদির গলায় তুলেছে।

সে রাত্রে নটরুর পাতে আস্ত কইমাচ পড়্‌ল, দুখানা বেগুন ভাজা, দু হাতা টক্।

আমার খালি চ্যাটাই-ই ভালো। কিছু না বলে' বালিশটি নটরুর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বালিশটা তেম্‌নি ওর বুকের তলায় গিয়ে সেঁধোল!

নন্তুর কাশি থামে না। ওর পাশে বসে' বুকে একটু হাত বুলিয়ে কে দেবে?

বাম্‌নিকে বল্লাম—বাম্‌নি, আমাকে সাত আনা পয়সা দিতে পারিস্?

বাম্‌নি দাঁত বা'র করে হাসে।—পয়সা দিয়ে কি করবি রে পচা?

বাম্‌নি আমাদের বাজার আর রান্না করে। পরিবেশন করে আহ্লাদি।

বল্লাম—ধারই না হয় দে।

—কি ক'রে শুধবি? আমার গালটা টিপে দেয়।

—মাষ্টারের এতগুলো দোক্তা তোকে দেবো বাম্‌নি।

—চুরি করে নাকি রে? আমার ঠোঁট্ দুটো আবার টিপে দেয়।

বাঁট্‌না বেটে বেটে বাম্‌নির আঙুলে কড়া পড়েছে।

ইস্কুল যেই ভাঙ্‌ল, পথে বেরিয়ে এলাম। ধূলায় চিঠিতে ডাক পড়েছে।

নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—পথের পর পথ ভাঙ্‌ছি। গাছের ছায়া তখন গাছের তলায় গুটিয়ে এসেছে।

—আমাকে একটা টাকা দেবেন?

জুড়ি-গাড়ীর মেয়ে অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। সঙ্গিনীর পানে চেয়ে মুচকে হেসে বলে—টাকা? টাকা দিয়ে কি করবে?

ঢোক গিলে বল্লাম—আমার মা আজ তিনদিন উপোষী—আমরা ভারি গরীব, আমার মা'র বড্ড অসুখ, পেটে ভীষণ ব্যথা!

চোখে জল এসে পড়েছিল। মা'র কথা বল্‌লেই চোখে জল আসে।

সঙ্গিনী বলে—কি আস্পর্দ্ধা ভিখারী ছেলেটার! টাকা চায়!

একটি ছেলে দোকান থেকে একটা এসেন্স্ কিনে এনে পথের-পাশে-দাঁড়ানো গাড়ীর পা-দানিতে পা রাখ্তে যেতেই এই কথাটি শুন্‌লে।

—যা যা বেরো, টাকা চাস্, এক টাকায় ক' পয়সা জানিস্?

আমি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পানে চেয়ে বলি—আমার মা কাল রাতে অনেকগুলি বমি করেছিল, তাতে রক্ত উঠেছে। টাকা নেই ব'লে ওষুধও নেই। আমার মা খুব যে কাঁদে।

ছেলেটি এসেন্সের ছিপি খুলে মেয়েটির চুলে, বুকের কাছের কাপড়গুলিতে লাগিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটির গালে চিবুকে ঠোঁটে চোখের কোলে হাসির হাস্নুহানা! এসেন্সের গন্ধে সমস্ত রাস্তা মাতোয়ারা।

একটা এসেন্সের শিশির দাম কত? এক টাকারও বেশি!

পথের পাশে ব'সে পড়েছি! যে হাত মাষ্টারের বেতের জন্য মেলে ধরতে অভ্যস্ত হয়েছিল সে এখন পয়সার জন্য প্রসারিত হচ্ছে। বেত পড়তে পারে, পয়সা পড়ে না।

—বিকেলে বাড়ী গিয়ে আমার মাকে হয় ত আর দেখ্তে পাব না। ওরা নিশ্চয়ই টেনে ছেঁচ্ড়াতে ছেঁচ্ড়াতে মাকে কেওড়াতলায় নিয়ে যাবে। বাবু, একটা পয়সা দিয়ে যান।

দু ঘণ্টায় দুটি পয়সার রোজগার হয়।

একটা চীনাবাদামওলা হেঁকে যাচ্ছিল। তখন পথের কাঁকড়গুলিও চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারি। ডাক্‌লাম—এক পয়সার মিশিয়ে দে...

না, থাক্। হয় ত যা কিন্‌তে যাব, তা দু পয়সা কম পড়্বে বলেই কেনা যাবে না। এ রাস্তার মোড়টা ভারি অপয়া নিশ্চয়। আবার পথ! তার শেষ আছে?

আরো বাষট্টি পয়সা।

প্রকাণ্ড মাঠ; বেজায় ভিড়। একদিনে সবাই যেন ঘর ছেড়েছে জোট বেঁধে!

—কি মশাই এখানে?

—খেলা; ফুটবল

চেঁচামেচিতে আকাশের কানে তালা লেগেছে। মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মাথা গলাতে চাই, কনুইর গুঁতো খাওয়ায় মাথা তখনো অভ্যস্ত হয় নি!

ভদ্রলোক খপ্ ক'রে আমার হাতটা ধ'রে ফেল্‌লে। চারপাশে লোকারণ্য জ'মে গেল।

—এই টুকুন্ ছোঁড়া, আমার পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা টাকা সরিয়েছে। দে শীগ্‌গির! চাঁটির পর চাঁটি, চড়ের পর চড়, চুল ধ'রে দারুণ ঝাঁকুনি! টাকাটা তখন আমার মুখের মধ্যে জিভের তলায়।

আর একজন বল্লে—পুলিশে দিয়ে দিন্ মশাই, সায়েস্তা হোক্!

—পুলিশ কি হবে? আমরা আছি কি কর্‌তে? আমার দুটো গাল কে একজন ভীষণ জোরে চেপে ধরল, দাঁতগুলো মড়্‌মড়্ ক'রে উঠেছে। টাকা তবু ছাড়ি না।

পুলিশকে খবর না দিলেও আসে। লাল পাগ্‌ড়ী দেখে সমস্ত দেহ কালিয়ে এল।

ভিড় হাল্কা হয়ে গেল। পুলিশ আমার কাছে এসে বল্লে—দে-দো।

টাকাটা মুখ থেকে বা'র ক'রে কাপড় দিয়ে মুছে ওর চক্‌চকে মুখখানির পানে একবার চেয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলুম।

কিন্তু আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে। পুলিশ আমার হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল না। টাকাটা হাতে ক'রে বেমালুম সোজাই চলেছে—এতবড় রাজত্বে সর্ব্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা, তার মুখে সেই ভাব স্পষ্ট আঁকা।

কিন্তু পিছনে তার ভিড় লেগে গেল।—টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

পুলিশ সে কথায় কোন কানও পাতে না। আপন মনে এঁকে বেঁকে চলে। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের পিছু পিছু আমিও চলি। পুলিশের পিছু নিয়ে আমাকে সবাই ভুলে গেছে!

ছেলেটিকে ভারি সাহসী বল্‌তে হবে,—পুলিশের রুলসুদ্ধ হাতটা ধ'রে ফেলে ব'ল্লে—টাকাটা নিয়ে কোথায় ভাগছিস্?

—কিসের টাকা ? পুলিশ বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

কে একজন খাপ্পা হয়ে তার সমুখের লোকটিকে পুলিশের গায়ে ঠেলে ফেলে। পুলিশ ধাক্কা খেয়ে মাটিতে একেবারে উবু হয়ে পড়ল, তার পাগড়ী গড়িয়ে গেল।—মার্ মার্ শালাকে।

একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। ভিড় পিছন হটে দাঁড়াল। আমিও সরে যাচ্ছিলাম, দেখি পায়ের কাছে কি একটা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেক্‌ছে। তুলে নিয়েই ছুট্। তখন সবাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। কেননা—

পুলিশ তার রুলটি বাগিয়ে নিয়ে মরিয়া হয়ে ভিড়ের মধ্যে অন্ধের মত চালাতে সুরু করেছে। একটি ছেলের মাথা ফেটে রক্তের ফোয়ারা, আরেকজন অজ্ঞান। লাল পাগড়ীর জোয়ার ডেকে এল—একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ।

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা গাছতলায় এসে নেতিয়ে পড়লাম। কাপড়ে ফের মুছে নিয়ে ওর চকচকে মুখখানা দেখতেই বুকটার মধ্যে ঝিরঝির ক'রে বাতাস বয়ে গেল। যেন আমার মা কোন্ দূর দেশ থেকে আমার হাতের তালুতে ছোট্ট একটি চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে ফের আহ্লাদি তার দুই হাতে ঘাড়টি তুলে তলায় ওর ময়লা গন্ধ-ওলা বালিশটা গুঁজে দিক।

মাঠ শুধু প্রকাণ্ড নয়, বাজারো প্রকাণ্ড—আলোয় আলোয় ঝলমল্ করছে। ঢুকতে গা ছমছমায়।

কি কিনি ? দিশা পাই না।

সাম্‌নেই একটা পুতুলের দোকান। এগিয়ে গিয়ে শুধোলাম—আমাকে একটা ডল্ দেবে ?

দোকানি হাসে, ঠাট্টা ক'রে বলে—মাগ্‌না ?

—না, না ; কম দামের মধ্যে। আমার ছোট বোন্‌টি তিনদিন ধ'রে একটা পুতুলের জন্য কাঁদ্‌ছে, দুধের বাটি ফেলে দিচ্ছে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার জ্বর হয়ে গেল। তার জন্য একটা ভাল দেখে ডল্ দাও। এটার দাম কত ?

—বহুৎ। এটা নাও। দাম দু' আনা।

দোকানি আমাকে ভেবেছে কি ? বলি—এটা ?

—পাঁচসিকে।

—আর কিছু কমিয়ে দাও না! বোন্‌টির যে পুতুলটা ভেঙে গিয়েছিল সেটা ঠিক এম্‌নিই দেখ্‌তে—এম্‌নি নীল চোখ, এম্‌নি ঘাঘ্‌রাটা। এক টাকা দি, কেমন ?

টাকাটার চকচকে মুখখানি আবার, শেষবার দেখে নিয়ে দোকানির হাতে দিলাম। দোকানি আপত্তি কর্‌ল না, চুপ ক'রে রইল।

দু পয়সায় এবার চীনেবাদাম খাওয়া যেতে পারে। কিম্বা বিড়ি।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভিক্ষুক দেখে মনে হয় কত ঘণ্টা ধরেই না জানি ও এম্‌নি নিস্ফল কাকুতি কর্‌ছে! পয়সা দুটো ওর পেটেই যাক্।

এই পুতুলটার মা হবে আহ্লাদি—বেশ হবে। খুকীর নাম কী রাখ্‌ব ?

পথ চিনে চিনে ইস্কুলে যখন এসে পৌঁছি তখনো বাইরে তুলসীতলায় আহ্লাদির-দেওয়া তেলের বাতিটি নেবে-নি।

দোরে পা দিতেই সমস্বরে সম্বর্দ্ধনা এল—এই যে পচা। এই ত' এসেছে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—এসেছে ? আর্ত্তনাদ ক'রে মাষ্টার তেড়ে বেরিয়ে এল। লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল আহ্লাদি। পুতুলটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ফেল্লাম।

অন্ধকার হ'লেও মাষ্টারের মুখ দেখে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল। কাউকে পাঠিয়ে মেহেদির ডাল ভেঙে আনাবার ধৈর্য্য মাষ্টারের ছিল না। ডান পায়ের খড়ম তুলে নিয়ে হাঁক্‌লে—চৌত্রিশ। সব সরে' দাঁড়াল।

আমার পিঠের হাড় ক'খানা চূর্ণ হয়ে গেল। চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম—আমি পথ হারিয়ে গেছ্‌লাম, এত বড় কল্‌কাতা সহর, কত কষ্টে এসেছি, কিছু খাই নি, আমাকে ছেলেধরা ধ'রে নিয়ে গেছ্‌ল।

মাথায় ছাব্বিশের বাড়িটা পড়তেই মাথাটা দু'হাতে চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়'লাম। পুতুলটাও আমার সঙ্গে ধূলাশয্যা নিতেই মাষ্টারের বাঁ পায়ের খড়মের চাপে—

চেঁচিয়ে উঠ'লাম—আমার পুতুল, আহ্লাদি,—খুকী খুকী...

অনেক অবান্তর কথা কয়ে ককিয়েছি, ও কথার অর্থও কেউ বোঝে নি।

আহ্লাদি আমার কান্না শুনে কাপড় দিয়ে মুখ ঠাস্‌ছে। কিন্তু গলায় যে ওর নটরুর দেওয়া সেই পুঁতির মালাটা।

সমস্ত বুকে পিঠে ব্যথা, কিন্তু বুকের ব্যথা পুতুলটার জন্য।

চ্যাটায়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। খাওয়া বন্ধ—মাষ্টারের হুকুম। নটরুটা বেজায় খুশী; বালিশটা আজো ওর বুকের তলায়।

পা টিপে টিপে যেমন চলা, তেম্‌নি আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে গেল। মাঝরাত, ঝিল্লি ডাকছে। হঠাৎ আহ্লাদির ঘর থেকে আর্ত্ত চীৎকার উঠল—চোর চোর!

ঘুম ছেড়ে সবাই হল্লা সুরু করেছে। মাষ্টার লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই আহ্লাদির ঘরে। ভয়ে কেউ একটা লণ্ঠন জ্বালাতে পর্য্যন্ত পারে না।

শেষকালে আমিই জ্বালালাম।

আহ্লাদি তখনো থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। মাষ্টার বল্লে—কোথায় চোর?

আহ্লাদি বল্লে—হ্যাঁ—; দরজা ঠেলে ভেতরে এসে আমার বিছানার ধারে বস্‌ল...

—তারপর? সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে।

—আমার গলাটা টিপে ধ'রে মালাটা ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিল।

সত্যি সত্যিই দেখ্‌লাম ওর সারা বিছানায় পুঁতিগুলি ঝ'রে পড়েছে—সোনালি পুঁতি।

—তারপর চোর বলে' চেঁচাতেই দরজা খুলে বাঁশ ঝোপের আড়াল দিয়ে পালিয়েছে—

—চল্ চল্ সবাই চল্। মাষ্টারের হুকুমে বাঁশ-ঝোঁপের আনাচে কানাচে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম সবাই, লণ্ঠন নিয়ে।

নটরু বল্লে—সোনালি পুঁতি কি না, চোরটা ভেবেছে বুঝি সোনার হার। বেটা ভারি জব্দ হয়েছে।

আহ্লাদি ঠোঁট ফাঁক ক'রে হাসে। বলে—বুক আমার এখনো কাঁপ্‌ছে ভাই! বেটা কি জোয়ান, সিংহের থাবার মতো হাত, আর একটু হ'লে গলা টিপেই মার্‌ছিল আর কি!

নটরু গলা খাটো ক'রে বল্লে—তোকে আমি সোনার হার দেব আহ্লাদি। তুই ভাবিস্ নে।

আহ্লাদি মিথ্যে কথা বলে। চোর কক্ষণো ওর গলা টিপে ধরে নি।

কত দিন পর মনে নেই, ঘুম ভেঙে মনে হল আহ্লাদির সমস্ত গা আহ্লাদে ভ'রে গেছে। ওর গায়ে একটা ব্লাউশ।

জিজ্ঞেস ক'রে ফেলি—কোথায় পেলি রে এ জামাটা?

আহ্লাদি মুচকে হাসে; কথা যেন বেরোয় না—মাষ্টার।

নটরু এসে বলে—কত দাম নিলে রে আহ্লাদি?

এ কি অন্ধ ভিখারীর ডালার আটাশ পয়সা? ঢের ঢের দাম। উর্মির একরত্তি একটা ফ্রক-এর দাম নিয়েছিল সাড়ে পাঁচটাকা। এমনি তার রঙ! সাড়ে পাঁচটাকা নটরু দেখেছে?

উর্মি আমার পাঁচ বছরের ছোট্ট মামাতো বোন—ঠোঁটের কিনারে ছোট্ট একটি তিল।

বাতিটায় তেল নেই, বইর আখর ঝাপসা হয়ে আস্‌ছে।—বলি নস্তু, আহ্লাদির কাছ থেকে একটু তেল চেয়ে আন্‌বি? পড়াটা তৈরী ক'রে ফেলি।

—তুই যা না। কেশে কেশে আমার দম আটকে আস্‌চে—আমি উঠতে পাচ্ছি না। তুই কোন্ নবাব পুত্তুর। ভুগে ভুগে নস্তুর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে।

একটা মোটে বাতি। বাতিটা নিবে গেল।

হারাণ বল্লে—আহ্লাদি কি করেই বা তেল দেবে? ওর তো জ্বর।

—জ্বর? কে বল্লে? বিকেলেও তো পেড়ে পেড়ে কুল খাচ্ছিল।

—তাতে কি? মাষ্টার ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকতে গেছে।

কেষ্ট খুব কম কথা কয়। সে হঠাৎ বলে উঠল—মাষ্টারের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। জ্বর আস্‌তে না আস্‌তেই ডাক্তার। আর নস্তু আজ পুরো একটা বছর কাশছে।

বাতি নিবতেই নটরু শুয়ে পড়েছিল। মাষ্টারের খড়মের আওয়াজে দোরের কাছে আস্‌তেই চেঁচিয়ে উঠল—পচা আলো নিবিয়ে দিয়েছে, পড়া করতে পারছি না।

আমিও চেঁচিয়ে বলি—তোর বালিশের তলায় ত বিড়ি ধরাবার দেশলাই আছে, দে' না।

অন্ধকারে তারপর ভীষণ মারামারি সুরু হয়। লাভ হয় না কিছুই। মাষ্টার বেত নিয়ে হাঁকে—একুশ।

আহ্লাদির জ্বরটা জোরেই এল বল্‌তে হবে।

সাঁঝ সাতটা থেকে ভোর সাতটা পর্য্যন্ত বারো ঘণ্টা ভাগ ক'রে তিনজন করে ডিউটি পড়ে।

সবার ভাগে চার ঘণ্টা। মাষ্টার ঘুমায়। তার ডিউটি দিনের বেলা। ইস্কুল আর বসে না।

ইস্কুলের খাতায় সব শেষে নাম বলে' ডিউটিও পড়্‌ল সব শেষে। সাতটা থেকে এগারোটা—ডিউটি পড়ুক আশা করি নি। ঐ টুকুন রাত ত প্রায় রোজই জাগি। এগারোটা থেকে তিনটে—ভারি সুন্দর সময়। বরাতে নেই।

ঘরে ঢুকেই বল্লাম—তোবায় না'ইবি আর আহ্লাদি?

আহ্লাদি দুটো হাত ধ'রে একেবারে বুকের কাছে টেনে বসিয়ে দেয়।

হঠাৎ শুধোই—তোর মাকে মনে পড়ে?

আহ্লাদি কি বলেছিল তার তাৎপর্য্য বুঝি নি। বলেছিল—ওর মা যখন চড়ুকতলায় খোলার ঘর ভাড়া নিলে তখন ও সাত বছরের। মাষ্টারের পয়সায় ওদের দিন গুজ্‌রান হয়। হঠাৎ ওর মা যখন মারা পড়ে, মাষ্টার তখন ওর হাত ধ'রে শ্মশান থেকে বরাবর এই আশ্রমে নিয়ে আসে।

বলি—মাষ্টার তোর কে হয়?

আহ্লাদি শুধু বলে—মাষ্টার।

পাখা কর্‌তে কর্‌তে হাতে ব্যথা ধরে। ঘুম পায়। কাঁহাতক ঠায় বসা যায় চুপ ক'রে?

—কি রে ঢুল্‌ছিস্? ঘুমোবি?

আবার পাখা চলে।

—আয়, ঘুমো। আহ্লাদি আমার মুখটা একেবারে তার বুকের ওপর চেপে ধরে।

—কতক্ষণ আর। এগারোটা বাজতেই ত' মাষ্টার চুলের ঝুঁটি ধ'রে তুলে নিয়ে যাবে।

—যাক্, এখনো ত' এগারোটা হয় নি। ব'লে গুণে গুণে আহ্লাদি আমার গালে ঠোঁটে এগারোটা চুমু দেয়। শব্দগুলি যেন আজো শুন্‌তে পাচ্ছি।

দক্ষিণের জান্‌লাটা খোলা ছিল।

নট্‌রু একেবারে মারমুখো। কোমর কেছে এসে বলে—তুই আহ্লাদিকে চুমু দিয়েছিস্?

প্রশ্ন শুনে তাক্ লেগে যায়।—দিয়েছি ত' দিয়েছি, তোর কি?

—আমার কি? বলে' সাঁ ক'রে গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

কিন্তু যুদ্ধে সেদিন হার্‌লাম না। আহ্লাদির চুম্বন আমার গায়ে সমস্ত রক্ত পাগল ক'রে দিয়েছে। নট্‌রু কেঁদে ফেলেছে। বল্লে—মাষ্টারকে আমি এখুনি বল্‌তে যাচ্ছি।

—যা না। এ ও বলিস্ আহ্লাদির চুমু না পেলেও পচার পঁচিশটে লাথি পেয়েছিস্।

নট্‌রু মাষ্টারকে বলে না বটে কিন্তু নন্তুর মাঝরাতের ডিউটি কেড়ে নেয়। ওকে বল্লে—খানিক বাদেই ত' তোর ঘড়্ ঘড়্ সুরু হবে। তুই যা, বালিশে মাথা

গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে থাক্‌গে যা। হেঁপোরোগী, ডিউটি দেয় না, যা।

নস্তু আপত্তি করে না। কিন্তু আমার মাথাটা যেন কেমন করে ওঠে।

নটরু দরজা ভেজিয়ে দেয়। আমি দক্ষিণের খোলা জানলার তলায় মাটির দেয়ালে পিঠ রেখে ঘুন্‌টি মেরে ব'সে থাকি।

তেম্‌নিই আহ্লাদি ওকে বুকের মধ্যে মুখ রেখে শুতে বলে। তেম্‌নি একের পর এক ঘনঘন শব্দ হয়।

মাষ্টার তখন ছিলিমে ব'সে ঝিমুচ্ছিল। ছুটে গিয়ে বলি—শীগগির আসুন, আহ্লাদির...

মাষ্টার হুঁকো ফেলে দিয়ে দৌড়ে আসে। বলে—কি?

—জানলা দিয়ে দেখুন।

মাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মুখ বাড়াই। নটরুর মুখটা তখনো আহ্লাদির মুখের ওপর। ওর খালি এগারো নয়, ওর বুঝি একশ' এগারো।

যা ভেবেছিলাম, তা কিছুই হয় না কিন্তু। মাষ্টার নটরুর শুধু কান ধ'রে আল্‌গোছে তুলে নিয়ে আসে। মাষ্টারের পায়ে কি আজ খড়ম নেই?

পরদিন আশ্রমকর্ত্তা এসে নটরুকে আশ্রম থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলে। মাষ্টারকে বল্লে—এতগুলো ছেলের মধ্যে এত বড় মেয়ে রাখা উচিত হবে না। ওকে সরাও।

নটরুর যে একটা প্যাট্‌রা ছিল, জান্‌তাম না। যাবার বেলায় সেটা খুল্‌ল, দেখ্‌লাম। নানান্ জিনিসে ভরা—লাট্টু, গুলি, আয়না চিরুণী, এমনকি আহ্লাদির ভাঙা কাঁচের চুড়ি পর্য্যন্ত।

বলি—কোথায় যাবি এবার?

—কোথায় আবার? পথে।

প্যাট্‌রাটা গুছোতে গুছোতে হঠাৎ থেমে বলে—এটা ঘাড়ে ক'রে কোথায় বা নিয়ে যাব? এটা থাক্। আহ্লাদি ভাল হলে এটা আহ্লাদিকে দিয়ে দিস্। ওর ব্লাউশ কাপড় রাখবে। দিবি ত' পচা? ব'লে আমার হাত ধরে। প্রথম দিনও সে আমার হাত ধরেছিল।

আমার চোখ ছল্‌ছল্ করে ওঠে।

নটরু বল্লে—আমার কিন্তু একাই বেরুবার কথা নয়। তুই মাষ্টারকে কেন বল্‌তে গেলি? আমার মত ডিউটি বদ্‌লে নিলেই ত' পারতিস্?

মাষ্টার এসে হুকুম দিয়ে যায়—পৌনে ছটার আগেই আশ্রম ছাড়তে হবে।

সবারই কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে দেরি হয়ে যায়। মাষ্টার পেছন থেকে ছুটে এসে নটরুর পিঠে সপাং ক'রে একটা বেত আছড়ে বলে—দু মিনিট দেরি হয়ে গেছে, দু মিনিটে আঠারো।

কেষ্ট রেগে বলে—দেখি কেমন দু' মিনিট বেশি হয়েছে। বা'র করুন ঘড়ি...

আবার বেত পড়তেই নটরু 'মাগো' ব'লে ছুটে পথে বেরিয়ে গেল! বাকি বেতগুলি এবার নিশ্চয়ই কেষ্টর পিঠে পড়বে।

ডাক্তারের বাড়ী মাষ্টার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এল।

মাষ্টার নটরুকে পুলিশে দেবে প্রতিজ্ঞা করলে। পথের পাশে অন্ধকারে গা ঢেকে মাষ্টারের পায়ে বাঁশ চালিয়েছে।

ঘরে এসে বলি—বেশ হয়েছে। পা দুটো গুঁড়িয়ে গেল না রে?

বালিশ থেকে মুখ তুলে নস্তু উবু শরীরটা একটু দুলিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—মাথায়ই তাক্ ক'রে মারতে গেছলাম, কিন্তু ফসকে গিয়ে লাগল মাষ্টারের গা'য়। ভয় করছিল বুকের সাঁইসাঁই আওয়াজ পেয়ে চিনে ফেলে। বেটা এখন চোঁচা ছুটলে ভাই, শেষে হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গেল...

আজ সমস্ত রাত নস্তুর পাশে ব'সে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দেবো। আহ্লাদির ডিউটি মাষ্টার দিক গে।

আহ্লাদিকে কিন্তু মাষ্টার সরাল না। ডোবার ধারে ছোট্ট একটি ঘরে আহ্লাদির কোয়ার্টার হল—বেড়া দিয়ে চারধার ঘেরা। হুকুম হল—যে ছেলে ঐ ধারে যাবে তার শাস্তি হবে নির্ব্বাসন।

তারপর—ভাব্‌তে অবাক লাগে—দু বছর কেটে গেল, তিন বছরও প্রায় ভরে এল—আহ্লাদিকে দেখি না। ঐ বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট বাড়ীটি ভোরের শুকতারার মত দূর আর সুন্দর মনে হয়।

ঐ বাড়ীতে কখন মিটমিট করে বাতি জ্বলে, কখন নিবে যায়, সব চেনা হয়ে গেছে। বেড়ার ঢাকনি দেওয়া ঘাটে বসে' গা ধুলে কখন ডোবার নীল্‌চে জল চঞ্চল হয়ে ওঠে, জানি। ঘুঁড়ি ওড়াবার সময় ইচ্ছা ক'রে ওর উঠোনে ঘুড়ি গোঁত্‌ মেরে ফেলে দিই, ও ঘুড়ি ছিঁড়ে রাখে নীল সবুজে বেগনা। তাতে লেখা থাকে আহ্লাদি, আহ্লাদি, আঁহ্লাদি।

আমি এখন সকল ছেলের পাণ্ডা—ইস্কুলে, সাঁতারে, খেজুর গাছে, মাটিচষায়, তামাকে আর বিঁড়িতে। দুপুরের ইস্কুল ছুটি হতেই মাষ্টার আমাকে বল্লে—তিন দিনের জন্য তোকে আশ্রমের ভার দিয়ে যেতে চাই, পারবি? তুই ত' এখন বেশ ওস্তাদ হয়েছিস।

—খুব পারব, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আহ্লাদিকে নিয়ে দেশে যাব। ওকে আর এখানে রাখ্‌ব না, ওর পিসীর কাছেই থাকবে।

আহ্লাদির আবার পিসী কে? এতদিন কোথায় ছিল? চুলোয়?

যাবার বেলায় আহ্লাদিকে একবার দেখতে পাই না। সন্ধ্যা উৎরে গেল। গাড়ী নিশ্চয়ই কত বন নদী পেরিয়ে ছুটেছে! আহ্লাদি ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয় ত। যদি যাবার আগে দূর থেকে বেড়ার ফাঁকে একটুখানির জন্যও ওর চোখদুটি রাখত।

চেয়ে দেখি বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে। যাবার বেলায় আহ্লাদি তার বাতির স্মৃতিচিহ্নটি আমাদের জন্য রেখে গেছে। বাতিটা যদি বেড়ায় লেগে' একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে সমস্ত আশ্রম পুড়ে যায়, বেশ হয়।

বারো বছরের ছেলের চোখে ঘুম আসে না। শেয়াল ডাকে, ঝরা পাতার ওপর দিয়ে সাপ হেঁটে যায়, ন্যাড়া খেজুর গাছ অন্ধকারে প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে—বারো বছরের ছেলের ভয় নাই, ডোবার ধারে পায়চারি ক'রে বেড়ায়।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। তিনবছর পর হলেও আহ্লাদির কান্না চিন্‌তে দেরি হোল না। তবে কি আহ্লাদিরা যায় নি? ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে?

ছুটে মাষ্টারকে জাগাতে গেলাম। কেউ নেই। দেয়ালের কোণে হুকোটি পর্য্যন্ত নেই। তার মানে?

—কেষ্ট, কেষ্ট, কে কাঁদছে শুনতে পাচ্ছিস? আহ্লাদি?

—আহ্লাদি? আহ্লাদি? ঘুম ভেঙে সব উঠে দাঁড়াল আতঙ্কে। নন্তু পর্য্যন্ত,—কোথায়?

আমরা সব সজ্জিত হয়ে নিলাম। বাঁশের লাঠি, দরজার খিল, ভাঙা ছাতা, লোহার ডাণ্ডা, পকেট ভ'রে ঢিল ছুরি দেশলাই নিয়ে এগেলাম। বল্লাম—আস্তে আস্তে আয়, হল্লা করিস নে, হৈ চৈ করলেই চোর পালিয়ে যাবে কিন্তু।

বসন্ত বল্লে—আজ নটুক থাকলে কোন ভাবনা ছিল না।

বল্লাম—তোরা চারপাশ ঘিরে থাকবি, আমি লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে সটান ঢুকে যাব ঘরে। চেঁচালেই সব হুড়মুড়্‌ ক'রে এসে পড়বি।

কান্নার বিরাম নেই, বাতাস চিরছে।

—আর যদি ভূত হয় আমাদের এতগুলোর চেঁচামিচিতে পাত্তাড়ি গুটোবে। রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

সবাই বেড়ার চারধারে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নটুকুর চেয়ে আমি যে কিছুই কম নই দেখাবার জন্যে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লাম।

বসন্ত বল্লে—জোরসে্ চেঁচাস্ কিন্তু। আমরা সব হুড়্মুড়্ ক'রে পড়্ব।

বাতিটা উস্কে দিয়ে দেখ্লাম, আহ্লাদি মাটির ওপর লুটিয়ে প'ড়ে, গোঙাচ্ছে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখি, তার পায়ের কাছে একটা মরা মেয়ে। মাটি রক্তে ভিজা—

আহ্লাদির গা ঠেলা দিয়ে ডাকি—আহ্লাদি! আহ্লাদি!—ওর গা ঠাণ্ডা!

চীৎকার শুনে বাইরে থেকে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্ল—মার্ মার্, মাথা ফাটিয়ে দে...

খোলা দরজা দিয়ে সবাই হুড়্মুড়্ করে তেড়ে এসে পড়েছে। দু হাতে ওদের ঠেলে দিয়ে বলি—সরে' দাঁড়া। ওরা সব স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কারো মুখে রা নেই।

আমার পুতুল মাষ্টার খড়মের চাপে চেপ্টে দিয়েছিল, নিজের পুতুল সে নিজেই ভাঙ্ল।

বাতি নিবে যায়।

যুগল সাহিত্যিক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

স্বামী বিনোদলাল বসু—এম এ (দর্শন), কলেজের অধ্যাপক। স্ত্রী রাধারাণী বি, এস, সি, বাটীতেই অধ্যাপনায় বিব্রতা। অবসর পাইলে স্বামীর সহিত সাহিত্যচর্চ্চা করেন।

বেলা প্রায় দশটা।

ঘোর বৃষ্টি। বিনোদলাল মুড়ি খাইয়াই কর্ম্মস্থলে যাবেন, কারণ, চা' খাওয়া শেষ হওয়ার পর এখনও উনোনের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নি। চাকর 'এমিগ্রেট্' করেছে। ঝি বলছে তার 'বেরিবেরি' হবে। খুকু হামাগুড়ি দিয়ে ব্যায়াম শিক্ষায় ব্যস্ত। বামনঠাকুর আপাততঃ নিরুদ্দেশ।

এমন সময় ধপ্ ক'রে একটা শব্দ এবং খুকুর চীৎকার। রাধারাণী দৌড়ে গেল। বিনোদলাল স্বীয় আসন হ'তে বলে উঠলেন—ব্যাপারখানা কি?

রাধারাণী। জলপ্রপাত ও তৎপর মাধ্যাকর্ষণ।

বিনোদলাল। বিছানা শুকুতে দেও।

রাধা। য়্যাব্‌নর্ম্যাল্ হিউমিডিটি। অসম্ভব

বিনোদ। আর্নিকা একটু দেও।

রাধা। দু ফোঁটা ছিল, কিন্তু কাল তুমি সন্ধ্যাবেলা বোধ হয় নক্স মনে করে ভুলে খেয়ে ফেলেছ'।

বিনোদ বাবুর সুস্থ শরীর, তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে গেল। বোধ হল' মাথাটা কেমন কেমন কচ্ছে'।

খুকুকে কোলে ক'রে রাধারাণীর পুনঃপ্রবেশ।

বিনোদ। শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

রাধা। ওটা 'আইডিয়া' মাত্র। বেলা প্রায় সাড়ে দশ।

বিনোদ। আমার সেকেণ্ড-আওয়ারের লেক্‌চার। খুকুর লাগে নাই ত?

রাধা। মাধ্যাকর্ষণটাও তোমার মতে আইডিয়ালিজ্‌ম্, সুতরাং জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি? তবে ইন্‌ষ্টিনের ল' অনুসারে আঘাতটা যত মনে ক'চ্ছি তত বোধ হয় না। তক্তপোষটা মোটে দুফুট উঁচু, ও সঙ্গে একটা বালিস নিয়ে পড়েছিল। যা' হোক পাশের ঘরে চল, ভাত তৈরী।

বিনোদ। (সাশ্চর্য্যে) কথাটা বুঝতে পাচ্ছি না।

রাধা। আজ যখন ডাল্টনের ল' পড়ছিলাম তখন এক্সপেরিমেণ্টের জন্য কুকারে একটু আলুভাতে ভাত রেঁধে ফেলেছি। বেশী হয় নাই বলে বলি নি ক।

২

বিনোদলাল কলেজে গেলে রাধারাণী খুকুকে নিয়ে বিনোদের জননীর নিকট গেল। তিনি চোখে দেখিতে পান না। মালা জপিতেছিলেন।

রাধা। মা! পা টিপে দেব কি?

জননী। রোজ রোজ পা টিপে দিস্ কিন্তু আমার অদৃষ্ট কি খারাপ, তোর সোনার মুখ চোখে দেখ্‌তে পাই নে!

রাধা। সেই অষুধটা চোখে দিয়ে দিই।

জননী। দে মা! জানি কি অষুধে সারে? তবে তোর পরশের গুণে যদি সারে। এমন কোমল হাত যে কারু হয় তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

খুকুকে কোলে দিয়ে রাধারাণী অষুধ দিতে লাগল। জননী আরাম পেয়ে বল্লেন—তুই এত সাবধানে অষুধ

লাগিয়ে দিস্ যে টেরও পাইনে। বিনু অমন পারে না, খুঁচিয়ে দেয়।

রাধা। মা! আমাদের এক্‌সপেরিমেণ্ট্ ক্লাসে বড় কড়াকড়ি ছিল। একটু তড়িতের কিংবা উত্তাপের এ-দিক ও-দিক হ'লে প্রাণ সংশয়। আমি তড়িত বড় ভাল বাসতেম।

জননী। তড়িত কি রকম মা?

রাধা। ইংরিজিতে বলে ইলেক্‌ট্রিসিটি। তাবের খবর, আলো, ফ্যান, সবই তারই জোরে চলে।

জননী। ওমা! তাকে ভালবাস্‌বি কি ক'রে?

রাধা। জগতের যে ঈশ্বর তাঁর প্রধান শক্তিরই সেই রূপ। কলের মধ্যে কেবল না এনে যদি মনের মধ্যেও তাকে আনতে পারি তবে বোধ হয়—

জননী। অন্ধও নয়নের আলো পায়? বৌ-মা! বৌ-মা! তোকে যে দেখতে পাচ্ছি মা! এই কি সোনার খুকুধন! তুই সামনে আয়। কাঁদছিস কেন? আনন্দে কাঁদছিস? সাত বচ্ছর অন্ধ। তোদের ত কথনো দেখি নি। কিন্তু তোর হাতের বালা চিনতে পাচ্ছি, ওটা যে আমারই বালা, তাই মনে আছে। বিনু কখন আস্‌বে? কোলে আয় না মা!

রাধারাণী। আমি যে সব কথা ব'লেছি তাঁকে বল্‌বেন না। তড়িত কিছুই না, অসুখেই সেরেছে! তাই বলে রাধারাণী শাশুড়ীর চরণযুগল চুম্বন ক'রে ব'ল্লে—আমি মাতৃহারা, আপনাকে পেয়ে অবধি তাঁর আসনে আপনাকে বসিয়েছি। আমি বড়ই ভাগ্যবতী।

৩

জননী চক্ষুলাভ করাতে বিনোদলালের মনে যে কত রকম আনন্দের ভাব এসেছিল, সেটা চেপে গিয়েছিল, কারণ দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তবে ব'লে থাকেন—ভগবানের কৃপা কিংবা অদৃষ্ট।

জননীর চ'খের দৃষ্টিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রন্ধনস্পৃহা বলবতী হয়ে পড়েছে। বামনঠাকুর বসে থাচ্ছিল, তাঁর কাছে জবাব পেয়ে সে প্রথমে ঝির উপর গেল চ'টে।

বামুনঠাকুর। আমার আট্‌টাকা ধারিস্ সেটা এখনিই শোধ ক'রে দে!

ঝি। তুমি কি রকম ঠাকুর গো? কোন্ কালে দুটাকা নিয়েছিলুম, তা সুদ সুদ্ধ আদায় ক'রে দিইছি।

চাকর রামা দেখ্‌লে যে, ঝির সঙ্গে এখন বনিয়ে চল্‌তে হবে, তাই সে সাক্ষীস্বরূপ জাহির কল্ল—আমি নিজেই ত তা দেখিছি।

বামনঠাকুর। ব্যাটা হারামজাদা মিথ্যাবাদী!

ঝি। মড়াখেকো বামুনের আক্কেল দেখ! একটা ভাল মানুষকে গালাগালি দিতে বস্‌ল।

বামনঠাকুর ঘোর গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল।

বিনোদলাল গোলমাল শুনে রাধারাণীর সঙ্গে দোতলার বারান্দা হ'তে নীচের ব্যাপার দেখ্‌ছিল। হঠাৎ খুন খারাপি হ'তে পারে তাই মনে ক'রে তিনি থামাতে যাচ্ছিলেন।

রাধারাণী। একটু দাঁড়িয়ে দেখ। ও কেবল হাত পা ঘুরচ্ছে, যেমন হাতা বেড়ী নিয়ে রোজ রাঁধে। এটা কেবল রিফ্লেক্স action, এখন 'ভলন্‌টরি, গতি মস্তির কোন চিহ্ন নেই।

এ-দিকে বামনঠাকুর প্রথম গর্জ্জনের পর দেখলে যে, চাকরটা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। তা'কে কি ক'রে জুতোপেটা করে সেই উদ্দেশ্যে জুতা জোড়া খুঁজতে গিয়ে দেখল যে, জুতাও অন্তর্ধান! খুব সম্ভব রামাই সেটা চুরি করেছে মনে করে সে রামার পৃষ্ঠদেশের আয়তন অধ্যবসায় সহকারে দেখে মনে ক'ল্ল যে, একটা ঘুষো মারাই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যাঁহাতক সঙ্কল্প তাঁহাতক্ কাজ, এবং যাঁহাতক কাজ, তাঁহাতক রামারও ধাক্কা মেরে বামুনকে ফেলে দেওয়া, এবং নিজেও কলতলায় পা পিছ্‌লে চিৎপাৎ হয়ে পড়া।

ঝি চীৎকার করে উঠ্‌ল। জননী ভয় পেয়ে বল্লেন—বিনু! দেখ্‌ত কি হয়েছে?

বিনোদ। দেখলে ত?

রাধারাণী। রি-অ্যাক্‌সন্‌। তুমি যেন মেতʼ না ওদের সঙ্গে। বরং মাকে বুঝিয়ে বল, বামনঠাকুরকে এখন রাখুন।

পাছে পুনরায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তাহাতে জননী রাজি হলেন। বামনঠাকুরেরও রাগ কমে এল, এবং এবার হ'তে রন্ধনের কাজ সময় মাফিক চলতে লাগল।

বিনোদ ফিরে এসে বল্ল রাণী। আমার অনেক সময় বোধ হয়—মানুষ যে কোনোকালে ইন্দ্রিয়সংযম ক'রবে এমন সম্ভাবনা নাই।

রাধারাণী একটু হেসে বল্ল—ছি অমন কথা বল্‌তে নেই। আমি খুকুধনকে দিয়ে দেখছি, সে ইন্দ্রিয় দিয়েই ইন্দ্রিয়সংযম করে। সে দিন খাট্ থেকে পড়ে অবধি খুব সাবধানে হামাগুড়ি দেয়, আর, শুনে আশ্চর্য্য হবে—আমাকে ধারে শুতে দেয় না। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলো অন্ধ—তুমি বল 'এনার্জি ব্লাইণ্ড'- তা স্বীকার করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো কর্ম্মফলের স্মৃতি বেশ মনের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখে।

বিনোদলাল। আত্মরক্ষার জন্য?

রাধারাণী। জগতের হিতের জন্যও।

বিনোদলাল। রাণী। ভালবাসাটা কোন্ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত?

রাধারাণী। সেটা জীবদ্দশায় বুঝিয়ে দিতে পারব, এমন বোধ হয় না।

পাশের বাড়ীতে সজোরে বিবাহের ধুমধাম হচ্ছে। বিনোদলাল "free will" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন। জননী, রাধারাণীর সঙ্গে ভাঁড়ারে বসে আস্‌ছে মাসের সংসারের খরচ সম্বন্ধে একটা এষ্টিমেট্ কচ্ছেন। খুকু অতি সাবধানে একটু বাটা হলুদ শিল হতে সংগ্রহ করে নাকের কাছে নিয়ে দেখ্‌ছে সেটা উপাদেয় পদার্থ কি না।

এমন সময় হঠাৎ বিনোদলাল এসে রাধারাণীকে উপরে ডেকে নিয়ে গেল।

রাধারাণী। ব্যাপারখানা কি?

বিনোদলাল। আমি বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনেচ্ছা নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি।

রাধারাণী। Natural Selection-এর বিরোধী তুমি নিশ্চয়।

বিনোদলাল। সেটা অন্ধ প্রবৃত্তি।

রাধারাণী। Courtship?

বিনোদলাল। সেটা তারই সভ্য সংস্করণ।

রাধারাণী। গুরুজনের নির্ব্বাচন?

বিনোদলাল। সেটা এখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বাজার-দর মাত্র।

রাধারাণী। বাকি রইল কেবল তোমার Hegel's doctrine—স্বাধীনেচ্ছা কেবল আধ্যাত্মিক ভাবে?

বিনোদলাল। এখনো ততদূর উন্নত খুব অল্প লোকেই হয়েছে।

রাধারাণী। তবে অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেওয়া কেন? যার কপালে যে জোটে সে জুটে যাক, তার পর স্বাধীনতায় চৌহদ্দি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দেখে শুনে বুঝে নেবে। তিক্ত বিরক্ত হলে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে Moral Lecture দিতে থাকবে।

বিনোদলাল। জেলখানার কয়েদীর জন্য সেটা প্রস্তাবিত হয়েছিল, কিন্তু তারা হেসে উড়িয়ে দেয়। বিবাহ জিনিষটা কি?

রাধারাণী। সমাজে প্রবেশ করবার দ্বার বিশেষ। বর ক'নের পক্ষে Lightning Conductor. উভয়েরই মাথায় বজ্রাঘাত, কিন্তু Conductor সাম্‌লে নেয়। যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা তোমার আবার বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছা করে না? তুমি নিশ্চয় বল্‌বে—না। আমি সেটা শুনে সুখী হব, কিন্তু বিশ্বাস ক'রব না।

বিনোদলাল। কেন?

রাধারাণী। যদি তোমার ইচ্ছাই না থাকে, তবে Free will মোটেই হবে না। যদি থাকে তবে বুঝতে পারব এখনও তোমার সম্পূর্ণ মানুষ হবার সম্ভাবনা আছে। ফারাডে, ডারউইন প্রভৃতি অনেক experiment ক'রে এক একটা তথ্যের আবিষ্কার করেছিল। একটা নয়, দুটো নয় 'ষোল-হাজারেও' লীলার শেষ নাই। প্রত্যেক যুগে একটা বিবাহ। প্রত্যেক যুগের জীব তার সন্তান।

বিনোদ। আমি মনে করেছিলেম, তুমি প্রকৃতিই মান, পুরুষ মান না।

রাধা। যখন তোমাকে মানি, তখন পুরুষও মানি।

বিনোদ। আমার বাসনা যদি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে?

রাধা। কোন্ উপায়ে?

বিনোদ। তোমাকে পেয়ে? তোমার প্রেমে।

রাধা। ছিঃ! অমন কথা বল্‌তে নাই। আমি খুকুর কাছে যাই, তার ঘুম ভাঙবার সময় হয়েছে।

(প্রস্থান)

মা, আজ খুকুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাড়ী নবমীর পূজো দেখ্‌তে যাব?

জননী। যাও মা। বিনোদকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাধারাণী বিনোদলালকে বন্দী করিয়া বলিল—চল, মা'র হুকুম!

বিনোদলাল বন্দী ভাবে মন্দিরে উপনীত হয়ে না জানি কোন্ ভাবে মগ্ন হয়ে প'ড়ল। সে ধীরে ধীরে বল্ল—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল বিশ্বজননীর কাছে।

খুকু চালচিত্তিরে মহাদেবের ছবি দেখে বড়ই খুসি।

বিনোদলাল। ওর নজর মহাদেবের উপরই দেখ্‌ছি পড়েছে?

রাধা। সন্ন্যাসী বলে' বোধ হয়। তোমার স্বভাব পেয়েছে।

বিনোদ। আমার বোধ হয় প্রেমিক বলে'! যুদ্ধ বিগ্রহের ভার তিনি দশভূজাকেই দিয়েছেন।

রাধা। সন্তানের স্বাধীনতার জন্য?

বিনোদ। তারা বাসনার উৎসর্গ ক'রবে ব'লে।

রাধা। আর একটা জিনিষ দেখেছ?

বিনোদ। কি?

রাধা। ছেলে ও মেয়ে দুটির মামার বাড়ী এসে কি আনন্দ!

বিনোদ। কেন বল ত?

রাধা। নূতন কাপড় পেয়েছে বলে'।

বিনোদ। আমি যে একেবারে সে কথা ভুলে গিয়েছিলেম। খুকুর কাপড়ের কি হল'?

রাধা। সেটা তোমার অধিকারের মধ্যে।

বিনোদ। তোমার হাতেই ত সব।

রাধা। দান ধ্যান তোমরা করবে, আমরা কেবল যুগিয়ে দেব। নিজের হাতে দেওয়া Purposive action, সঙ্গে সঙ্গে উৎসর্গ। এই ভিক্ষাটুকু দেখবার জন্য বাবা কৈলাস হতে' নেমে আসেন। তুমি যদি অনুগ্রহ করে একটু দেখিয়ে দেও।

বিনোদলাল লজ্জিত হয়ে বল্ল—বেশ। এখন একবার মায়ের পায়ে প্রণাম ক'রে চল বাড়ী যাই।

৬

বিসর্জ্জনের দিন বিসর্জ্জনের পর প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি সেরে নিয়ে একটা আঁধার ঘরে ব'সে বিনোদলাল মায়া সম্বন্ধে চিন্তা কচ্ছিল। রাধারাণী চুপি চুপি এসে অজ্ঞাতসারে স্বামীর চ'খ টিপে ধরল।

বিনোদ। আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কে?

রাধা। কেমন ক'রে?

বিনোদ। পরশে।

রাধা। যদি কখনো দুজনের পরলোকে দেখা হয় তখন চিন্‌বে কি ক'রে?

বিনোদ। তুমি কি পরলোক মান?

রাধা। সৃষ্টি, শক্তি, জীব, সবই অনাদি ও অনন্ত। কিছুই নশ্বর নয়, কিছুই অসত্য নয়, কিছুই মায়ার নয়। শক্তির ধ্বংস নাই। হয় ত হাওয়া বদলানোর দরকার হয় পরলোকে মাঝে মাঝে। কিন্তু সহস্র সৌরজগত আস্‌বে যাবে, কিন্তু জীবাত্মার বিনাশ হবে না।

বিনোদ। তবে তোমার আমার সম্বন্ধ?

রাধা। তুমি আমার পরশটুকু দুদিনে ভুলে যাবে। আর একটা পরশে এটা মুছে যাবে। 'আমার অস্তিত্ব তোমার কাছে থাক্‌বে না। কিন্তু প্রিয়তম! আমি সতী

বলে' স্পর্দ্ধা করে থাকি। তোমার পরশ জন্মে জন্মে আমার মধ্যে থাকবে। কিছুতেই সেটা মুছবে না। শত শত বার জগতের পরিবর্ত্তন হ'লেও আমি তোমাকে চিনে নেব। তুমি যে লোকেই থাক, যেরূপেই থাক আমি দেখতে পাব, তোমার শব্দ শুনতে পাব। আমি সেদিন একটা Electric Circuit ক'রে, গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে দেখছিলেম যে Sound impression অনন্তকালেও নষ্ট হয় না। তবে, জগতের মহাকল্লোলের মধ্যে সেটা হারিয়ে যায়।

বিনোদ। বাণী। তোমার doctrine টা materialistic, কিন্তু তোমাকে দিয়ে অনেকটা বুঝতে পাচ্ছি যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত নহেন।

উভয়ের হৃদয় দম্পতীর সন্ধ্যার একই আধারে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

সমালোচনা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমরা যারা লিখি, আমরা সকলেই চাই যে আমাদের লেখার অপরে সমালোচনা করুক। এর কারণও অতি স্পষ্ট। লেখকমাত্রেই লেখেন পাঠকের জন্য। যদি আমাদের লেখা সম্বন্ধে সকলে নীরব থাকেন ত বুঝতে পারি নে যে, সে লেখা কেউ পড়েছেন কি না। অপর পক্ষে তার সমালোচনার সাক্ষাৎ পেলেই আমরা এই মনে করে কতকটা স্বস্তি অনুভব করি যে, অন্তত একজন পাঠকও তা পড়েছেন।

সমালোচনামাত্রেই যে স্তুতিবাচক হবে এমন কোনও কথা নেই বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তার ঠিক উল্টো হয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে তাতে লেখকদের বড় বেশি আসে যায় না।

আমরা সকলেই অবশ্য প্রশংসালোভী। এবং একজন পাঠকও যদি আমাদের রচনার সুখ্যাতি করেন তাহলেই আমরা হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু সমালোচকের মুখে প্রশংসার মত নিন্দারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। নিন্দার প্রসাদেও আমাদের লেখা জনসমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠে। বিজ্ঞাপন হিসেবে কোন বইয়ের নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে কোন্‌টি বেশী মূল্যবান বলা কঠিন। অনেক সমালোচক-নিন্দিত সাহিত্যও যে সমাজে দিব্যি চলে যায়, তার প্রমাণ দেদার আছে। একখানি সেকেলে কাব্যের নাম করলেই বুঝতে পারবেন যে, আমার কথা ঠিক। বিদ্যাসুন্দরকে অনেকদিন থেকেই লোকে অপাঠ্য বলে আসছে। অথচ আমার বিশ্বাস বিদ্যাসুন্দরের প্রচলন বাঙালী সমাজে মোটেই

কম নয়। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে ও-কাব্যের নিন্দা ত বহুকালাবধি সকল শিক্ষিত লোকের মুখেই শোনা গিয়েছে, তৎসত্বেও ভারতচন্দ্রকে কবি বলতে আজকের দিনে আমরা ভয় পাই নে। যে কারণে ভারতচন্দ্র নিন্দিত, সে কারণে আজকের দিনে যদি কোনও লেখক নিন্দিত হন তাহলে সে নিন্দা তাঁর পক্ষে একটা মস্ত বিজ্ঞাপন হবে।

সে যাই হোক্, এ কথা নির্ভুল যে, আমরা লেখকরা চাই সমালোচকদের কাছ থেকে নিন্দা নয়—প্রশংসা। এ আমাদের জাতিধর্ম। লেখকেরা আবহমানকাল প্রশংসার ভিখারী ছিলেন, আজও আছেন। "গুণী গুণং বেত্তি" "মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদা" এ সকল সংস্কৃত বচন লেখকদের হাত থেকে বেরিয়েছে সমালোচকদের হাত থেকে নয়।

সাহিত্যিকদের এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও ফল নেই। এ প্রবৃত্তিকে দুর্ব্বলতা বললেও সে দুর্ব্বলতা আমরা ত্যাগ করতে পারব না, আর যিনি পারেন তাঁর পত্রপাঠ সমালোচকদের দলে গিয়ে ভর্তি হওয়া উচিত।

কে না জানে যে বাহবা না পেলে গাইয়ে বাজিয়েরা আসর জমাতে পারে না। এবং যে শ্রোতা যত বেশীবার "কিয়াবাৎ" "কিয়াবাৎ" বলে, ওস্তাদেরা তাকেই তত বড় সমজদার বলে মেনে নেন। এর কারণও স্পষ্টই। সাহিত্যের ফুল অনুকূল জল বায়ু না পেলে স্ব-রূপে ফুটে উঠতে পারে না। এই প্রশংসা জিনিষটে হচ্চে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির একটি প্রধান সহায়। কাব্যের রস উপভোগ করবার অক্ষমতা সমালোচকদের একটা ক্ষমতার মধ্যে গণ্য নয়।

ইংলণ্ডের সর্ব্বাগ্রগণ্য মনীষি Bertrand Russell তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন বইয়ে লিখেছেন যে—

Praise is less harmful. But it should not be given so easily as to lose its value, nor should it be used to over-stimulate a child."

উপরোক্ত child কথা থেকেই বুঝতে পারছেন যে, এ হচ্চে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা সাহিত্যিকরা উকিল মোক্তার পলিটিসিয়ান দোকানদারদের মত্তে কি সব শিশু নই? অন্তত সমাজ উপরোক্ত সেয়ানাদের তুলনায় আমাদের কি ছেলেমানুষ হিসেবে দেখেন না? অতএব Russell-এর মতানুসরণ করে সমালোচকদের আমাদের প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমালোচকদের একটু বিপদ আছে। তাঁরা যদি রামের প্রশংসা করেন ত শ্যাম মনক্ষুণ্ণ হবে এবং এ অবস্থায় শ্যামচন্দ্রকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, রামচন্দ্রের প্রশংসার অর্থ শ্যামচন্দ্রের নিন্দা নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে কথাটা আর একটু পরিষ্কার করছি। গত মাসের কল্লোলে শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিন-খানি বইয়ের গুণ গেয়েছেন। তার মধ্যে একখানি হচ্চে "গড্ডলিকা"। কিছুদিন পূর্ব্বে আমিও এ বইয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ প্রশংসা সূত্রে এক জাগায় বলেছিলুম যে, বঙ্গসাহিত্যে এর তুলনা নেই। এই কথা শুনে বীরবল যদি ব্যাজার হতেন ত ভেবে দেখুন কি মুস্কিলেই পড়তুম। তখন তাঁকে গিয়ে বলতে হত যে, "গড্ডলিকার হাস্যরস আর তোমার হাস্যরস এক জাতীয় নয়।" এ কথা শুনে তিনি যদি প্রশ্ন করতেন যে, ও-দুয়ের প্রভেদটা কি? তাহলে উত্তরে আলঙ্কারিকদের এই বচন আওড়াতে বাধ্য হতুম।

ইক্ষুক্ষীর গুড়াদীনাং মাধুর্য্য স্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥

বীরবলের উদাহরণ দিচ্ছি এই কারণে যে, তিনি আমার ঘরের লোক, সুতরাং তাঁর নাম করায় আমার বিশেষ কোনও ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু বীরবল না হয়ে যদি কোন নির্ব্বল রসিক আমার উপর নারাজ হতেন সেটা অবশ্য নিতান্ত আক্ষেপের কারণ হত। শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদের সমালোচনার উপর আপনারা যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাই পড়েই আমার মনে এই কথা উদয় হয়েছে যে, সমালোচকের পক্ষে এ যুগে কারও প্রশংসা করা তার নিন্দা করার চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। এ যুগ ত আর বঙ্গদর্শনের যুগ নয়, যখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লেখকদের সরাসরি বিচার করতেন ও খুসী মত তাদের তিরস্কৃত ও পুরস্কৃত করতেন ও পাঠক-সমাজ তাঁর কথাই বেদ বাক্য বলে মেনে নিত। এ যুগ যে সাহিত্যেরও

ডিমোক্রাটিক যুগ। আপনারা জানিয়ে রেখেছেন যে, শ্রীযুক্ত ধূর্জটীপ্রসাদের প্রবন্ধের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন কথাই আপনারা প্রকাশ করবেন না। তবুও আমি যে এ বিষয়ে দু-চার কথা বলছি তার কারণ উক্ত প্রবন্ধ আমার আলোচ্য বিষয় নয়, শুধু আলোচনার উপলক্ষ্য মাত্র। কোনও সমালোচকের কোনও মতামতের প্রতিবাদ কিম্বা সমর্থন করবার দিন এখন চলে গিয়েছে। কেন না এ যুগে সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু ব্যক্তিগত মতামতেরই অর্থ ও সার্থকতা আছে।

এ যুগে নিজের মন ছাড়া অপর কোনরকম কষ্টিপাথর লোকের হাতে নেই যার সাহায্যে সে সাহিত্যের দর কষে দেবে। ইংরেজীতে যাকে বলে Cannons of Critricism —এ যুগে সে সব বিলকুল বাতিল হয়ে গিয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে কেউ কস্মিনকালেও কাব্যরচনা করতে পারেন নি এবং সেকালেও কবিরা সে শাস্ত্রের নিষেধও পদে পদে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে' কাব্যদেহের দোষের একটা লম্বা ফর্দ্দ আছে অথচ আলঙ্কারিকরাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দোষ হয়ে গুণ হল কবির বিস্তার। "দৈব-বিধান" যে "শাস্ত্র-বিধানের" চাইতে প্রবল এ কথাও তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে বলে গিয়েছেন।

এ যুগে আমরা এ ক্ষেত্রে কোনরূপ শাস্ত্রবিধান গ্রাহ্য করতে পারি নে, ফলে উক্ত বিধান অনুসারে এ কাব্য, ও নয় এমন কথাও বলতে অধিকারী নই। কারণ দেখতে পাওয়া যায় যে, নিত্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে যা কোনও পুরোনো নিয়মের অধীন নয়। ফলে সাহিত্য-সমালোচনার জন্য সমালোচকেরা নিজের রুচির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য। এক হিসেবে এটি দুঃখের বিষয়, কারণ প্রতিব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের রুচির উপর নির্ভর করেন তাহলে সামাজিক রুচি বলে কোনও জিনিষ জন্মাতে পারে না—ফলে এ ক্ষেত্রে যা জন্মায় তার নাম critical anarchism কিন্তু তা সত্বেও এ যুগে সমালোচকদের মেনে নিতে হবে যে, সমালোচনা করার অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। এতে যিনি ভয় পান তাঁর পক্ষে সমালোচনা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। লেখক-দলকে লালনপালন শাসন সংরক্ষণ করবার দায়িত্ব এ যুগের সমালোচকদের নেই।

সুবর্ণ সরোজাসীনা কমলার কম করপুটে
সাগরমন্থনদিনে ধীরে ধীরে উঠেছিল ফুটে
বিশ্বের ভরসারূপে ভবিষ্যের মহাসঞ্জীবনী,—
জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রিয়া কন্যা হরিৎ বরণী,—
স্বর্ণশীর্ষা ধান্যের মঞ্জরী।
সুরাসুর ধীরে নিল বরি'
আপন আলয়-মাঝে মহোল্লাসে পৃথ্বী-দুহিতারে,
সঁপিল আবাস তা'রে বিদূরিয়া কাননে কান্তারে।

বারিধির বক্ষতলে স্তনবীনা ধরা ;—
কিশোর জীবন তা'র সুবিপুল আকাঙ্ক্ষায় ভরা।
আন্দোলিছে বক্ষ তা'র নব নব সৃষ্টির হিল্লোলে ;
মহাকলরোলে
সুমহান জীবস্রোত ধেয়ে আসে বাধাবন্ধহারা।
সংক্ষোভ বিরোধ বাজে, কাঁপি উঠে গ্রহচন্দ্রতারা।

সে মহাসৃজনক্ষণে অন্নপূর্ণাভাণ্ডারের লাগি'
ধীরে ধীরে বিধাতার বর নিল মাগি'
ছিন্ন করি' ক্লেশজাল, প্রশমিয়া ক্ষুধা তম-রাশি,
হেসেছিল সুশোভন হাসি
বিস্তীর্ণ প্রান্তরতলে, সূর্য্যকরে, পবন-হিল্লোলে,
ধান্যের মঞ্জরী-দল মহাধাত্রী বসুন্ধরা-কোলে।

সে হাসি আজিও তা'রা বিস্তারিছে দক্ষিণপবনে,
তরঙ্গিত মহাশান্তি বিরাজিছে ভুবন-প্রাঙ্গণে।
দ্বেষ-হিংসা-কোলাহলে সভ্যতার আদিযুগ হ'তে
কমলার প্রিয়পাত্রী বিরাজিছে আজিও মরতে।
আজিও শরতে হেরি তারি পাশে ফুটে কাশফুল,
ঘাট-মাঠ-পথ-বাট আজো তার সৌরভে আকুল।

চলিছে উৎসব ;
আনন্দ-ভবনমাঝে নিশিদিন উঠে কলরব।—
অন্ন দাও, অন্ন দাও ; জলে স্থলে তাই চারিদিকে
চলিছে প্রচেষ্টা নানা। হেরি অনিমিখে
দুলিছে ধান্যের শীর্ষ বরাভয়া জননীর বেশে ;
কৃষক গাহিছে গান। কণ্ঠ তার প্রান্তরের শেষে
ধীরে ধীরে বায়ুভরে অতিদূরে মেশে একেবারে ;
হে লক্ষ্মী, সঁপেছ তুমি মৌন অশ্রুধারে
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধান্যক্ষেত্র মাঝে।
তাই প্রাণে বাজে
বিশ্ব-সঙ্গীতের রেশ সন্তোষের সুবিচিত্র তালে ;
মানবের ভালে
তাই ভাতে সুখরশ্মি ক্ষণিকের অতিথির মত ;
চক্ষে তার ভাসে জ্যোতি, বক্ষে আশা জাগিছে সতত।

আজি দূর মাঠ-ঘাট ভরি'
ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা হেরিতেছি দিবস-শর্ব্বরী ,
ভারতের নভতলে বহুদূর দৃষ্টি নাহি চলে ;
ঘনমেঘে বারিপাতে আবরিছে শুধু পলে পলে ।
দিগন্ত তিমিরাবৃতা ; সন্-সন্ বহিছে পবন ।
তুলিছে অঞ্চল তব—সুবিস্তীর্ণ হরিৎ-কেতন ।

হেরি পরপারে,—
নির্ম্মল গগনতল ; মেঘরাশি নাহি স্তারে স্তারে ;
ধরণী পঙ্কিল নহে, নাহি সেথা মত্ত বারিধারা ;
তেজস্বী ধরণীশিশু চূর্ণ করি, পাষাণের কারা
প্রবাহ আনিছে বহি' রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের' পরে ;
জড়তা নাহি ক' আর । হেরি থরে থরে
বিরাজিছ তুমি দেবী, সুপ্রসন্না সন্তান-গৌরবে ;
বিজেতা তনয় তব ব্যাপে মহী সুগম্ভীর রবে ।

হেরিনু চাহিয়া
সুদূর প্রান্তর 'পরে স্নিগ্ধ করি' তনুমনহিয়া
দক্ষিণপবনসাথে ক্রীড়া করে মঞ্জরীর দল ।
পল্লবে চলিছে লীলা । শুভ্র ধেনু চরিছে কেবল ।
যেন হেরি মহাশান্তি স্তরে স্তরে করিছে বিরাজ ;
স্তব্ধ, শান্ত বসুন্ধরা পরিয়াছে যেন শ্যামসাজ ।

ভাতিল সম্মুখে সিন্ধু অনন্ত উদার ।
সংক্ষুব্ধ সাগর বক্ষ আন্দোলিয়া বিপুল দুর্ব্বার
সাগরমন্থন করে পোতারোহী সার্থবাহদল ;
কমলার করপুটে ধান্যশীর্ষ নাহিক কেবল ।
আছে তাঁর পদ্মহস্তে শ্রমিকের রক্ত-রাঙা ধন !
ধরার বিশাল বক্ষ তারি লাগি' করিছে খনন
ধনতৃষ্ণাভারাতুর রক্তশোষী নিশাচর প্রায়
স্তম্ভিত, ব্যথিত পৃথ্বী রসধারা নীরবে শুকায় ।

স্বার্থ জাগে, জাগে দ্বেষ ধীরে ধীরে জাগে কোলাহল ;
দক্ষিণপবনে হেরি ক্রীড়া করে মঞ্জরীর দল ।

আলো-ছায়া

শ্রীসুরমা দেবী

শরতের স্নিগ্ধ প্রভাত—স্বচ্ছ নীল আকাশের বুকে শাঁখের মত সাদা অসংখ্য মেঘের টুকরোগুলি ঠিক কাশ-ফুলের মতই ফুটে উঠেছে। ঝিরঝিরে মৃদু বাতাস, গাছের শাখাগুলিকে অল্প অল্প দোল দিচ্ছিল—ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিকে রোদ—কয়েকটা পাখীর সম্মিলিত কূজনধ্বনিতে বোর্ডিং-এর ছোট বাগানটি তখন মনোরম হয়ে উঠেছে।

সেদিন শনিবার, ইস্কুল বন্ধ। দোতলার বারান্ডার মাঝের ঘরখানার মোটা সবুজ পর্দা সরিয়ে সুফলা বাইরে এলো—হাতে তার একটি বেতের বাক্স। সামনের গাছে একটা রংচং-এ নতুন ধরণের পাখী শিষ দিচ্ছিল, তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সুফলা একটা বেতের চৌকী টেনে নিয়ে বসে বাক্স থেকে সেলাইটা তুলে নিলে।

নীচে বাগানে ঘাসের উপর থার্ড সেকেণ্ড ক্লাশের কয়েকটি মেয়ে গল্প করছিল। পূজার ছুটী এগিয়ে এসেছে, বাড়ী যাবার আনন্দে সকলেই উৎফুল্ল, তবু মাঝে মাঝে আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তারা ম্রিয়মাণ—তাই একটু পেলেই, বৃথা সময়ক্ষেপ না করে তারা সকলেই পরস্পরের কাছে আসবার চেষ্টা করে, আর তাদের গল্প হাসির স্রোতে বিচ্ছেদের দুঃখ কোথায় ভেসে চলে যায়।

আচমকা একটা দমকা হাওয়ায় বারান্ডার নীচের শিউলি গাছটার কতকগুলো ফুল ঝর ঝর ক'রে মাটিতে ঝরে পড়লো। সুফলা সেই দিকে চেয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে। কিছুদিন আগে এমনই এক শারদ প্রভাতে, অদৃষ্ট দেবতার নির্ম্মম আঘাতে তার জীবনটাও যে ঐ সামনের ফুলগুলোর মতই ঝরে গেছে। কিন্তু ফুল ঝরে, রিক্তশাখা আবার ফুলে ফুলে ভরে ওঠে কিন্তু তার জীবন?

নীচে বাগানে বন্ধুদের অনুরোধে সুজাতা তখন গল্প ছেড়ে তার মধুর কণ্ঠে শরতকে অভিনন্দিত কোরছিল—

"শরৎ আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।"

সুর-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে সুফলা একটু এগিয়ে থামের আড়ালে এসে দাঁড়াল—পাছে শিক্ষয়িত্রীকে সামনে দেখে মেয়েদের আনন্দে বাধা পড়ে!

"তারি সোনার কাঁকন বাজে, আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।"

একটি একটি করে পদ্মের দল খোলার মত সুজাতার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে চড়তে সুরু কোরল। গানটি দুবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে থামবার পরেও সুফলার মনের মধ্যে সে সুরের রেশ ভেসে বেড়াতে লাগল—আজকে সকালে গানের সুর তার মনের মাঝে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেছে—সে তন্ময় হয়ে শুনলে সুজাতা আবার গান ধরেছে—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজায়ে এনেছি ডালা।"

মেয়েদের কলহাস্যে হঠাৎ সুফলা চমকে উঠ্‌লো—কখন যে গান বন্ধ করে তারা গল্পে মেতেছে, তা সে বুঝতে পারে নি। কপালের উপর অন্যমনস্কভাবে হাত বুলোতে বুলোতে সে চেয়ারে এসে বসে পড়লো। বাগানের ঐ সব মেয়েদের মত তারও ত জীবন অমনই নিশ্চিন্ত, আনন্দের উৎস ছিল! অনাবিল আমোদ হাসির ফোয়ারায়, গানে গল্পে সেও ত একদিন তার বন্ধুদের মনে প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগিয়ে এসেছে! আর সে ত বেশী দিনের কথা নয়! যে সব কথা সে ভুলতে চায়, এক এক করে সেই সব কথাই তার মনের সামনে ভেসে উঠ্‌লো—তার চোখ দুটোয় জলে ভরে এলো।

দুই ভায়ের পর এক বোন সে—বাড়ীর সবায়ের অত্যধিক আদরে মানুষ হয়েছে—বাপ তার ব্যারিষ্টার। তাদের বাড়ীর চালচলন ছিল সাহেবী, ভায়েরা তার বরাবরই সাহেবদের স্কুলে পড়েছে, সে শুধু মায়ের অত্যন্ত অনুরোধে বাংলা স্কুলে পড়বার অনুমতি বাপের কাছে পেয়েছিল।

স্কুল-জীবনটা তার কতই না সুখের ছিল! শিক্ষয়িত্রীদের প্রিয়পাত্রী, বন্ধুদের ভালবাসার সাথী, সুফলার সে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনের মাত্র একটা পুরাণ মিষ্টি স্মৃতি ছাড়া আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্কুলের কথা মনে পড়লেই দুজনকে তার বেশী করে মনে আসে—পুষ্প-দি আর শোভা—যাদের সে প্রাণ ভরে ভালবেসেছিল, আর ভালবাসা পেয়েছিল।

পুষ্প-দি'র সুন্দর চোখ দুটির দিকে চাইলেই তার মনে হোত যেন অসীম করুণার ধারা তার মধ্যে থেকে বয়ে যাচ্ছে, তাঁকে প্রথম দেখেই সুফলা ভাল না বেসে থাকতে পারে নি। যতক্ষণ সে স্কুলে থাকৃতো, তাঁকে সে চোখের আড়াল কোরতে পারত না, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার মুখ লাল হয়ে উঠতো, বুক ধড়ফড় করে কথা জড়িয়ে আসত। বাড়ীতে এসেও সে পুষ্প-দি'র কথা ভুলতে পারত না। বাপের অনিচ্ছা, মায়ের বকুনি, ভায়েদের অনুরোধ ঠেলে ফেলে অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়েও সে স্কুল কোরেছে, পুষ্প-দি'কে না দেখলে একদিন যে তার চলে না।

তারপর একদিন বিয়ে করে পুষ্প-দি যখন স্কুলের কাজ ছেড়ে দিলেন, সে দিন সে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল!

তারপর শোভা? সুন্দর সে ছোট মেয়েটি, তাকে ভালবেসেছিল। সেদিন মাঠে ঘাসের উপর বসে ছায়া যখন বেলা-দি'র কোঁকড়া কালো চুল, আ'র মিষ্টি হাসির গল্পে সভা জমাচ্ছিল, মুক্তি ছুটে এসে তার হাতখানা সজোরে নেড়ে একটু হেসে বল্লে, শুনছিস্ সুফল, তোরও যে এবার একটি—এ হাসির অর্থ শুধু সুফল নয়, সকলেই বুঝতো—খুব আগ্রহপূর্ণস্বরে তারা বল্লে, কে? কে? বেলা দি'র গল্পে বাধা দিয়ে অকালে রসভঙ্গ করায় ছায়া শুধু চটে গিয়ে তার মুখের দিকে কটমট করে চাইলে।

মুক্তির নির্দ্দেশ মত সুফলা সত্যই অদূরে ঐ একটি মেয়েকে দেখলে—তার হাতে একখানা বই, মাঝে মাঝে আড়চোখে সে তার দিকে চাইছিল। সকলের লক্ষ্য এখন তার দিকে পড়ায় সে লজ্জা পেয়ে উঠে গেল।

তারপর কেমন করে শোভার সঙ্গে তার মনের ঘনিষ্ট যোগ ঘটে গেছে, তা সে নিজেও জানে না! মাঝে ক্লাশের ব্যবধান বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও, ছোটর শ্রদ্ধা বড়র স্নেহ ঘুচিয়ে দিয়ে তারা পরস্পরকে ভালবেসেছে সব সময় কাছে কাছে থাকা, একসঙ্গে বেড়ান, কাঁচে সুদৃশ্য চুড়ী, বই, সেণ্ট, ক্লীপ, রিবণ ইত্যাদি উপহার দেওা এবং একদিন স্কুল কামাই কোরলে চিঠি লেখার ধু দেখে মেয়েরা তাদের ঠাট্টা কোরে বলতো, কর্ত্তা-গিন্নি শোভার স্বভাব ছিল ভারি মিশুক এবং আমোদপ্রি সে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশত, আর নানার

মুখভঙ্গি করে বুড়ো মানুষের মত ভারিক্কি চালে কথা বলে সকলকে হাসাতো—ছোট বড় সব মেয়ের কাছেই সে ঠাকুরমা নামে পরিচিত ছিল— সুফলাও অল্পদিনেই সকলকার ঠাকুর-দা হয়ে দাঁড়াল।

বন্ধুদের হাসিগল্পে, শোভার ভালবাসায়, বাপ মা ভাইদের স্নেহে ভারি আনন্দে তখনকার দিনগুলো কেটেছে সে সব কথা ভাবতে আজও তার বড় তৃপ্তি হয়।

শোভার এখন বিয়ে হয়ে গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহিনী, দুটি ফুলের মত শিশুর জননী শোভা নিজের সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, আগের জীবনের সব কথা একেবারে সে ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে সে তাকে চিঠি লেখে, স্বামী, সংসার, খোকা খুকুর কথা সবিস্তারে লিখে অনুরোধ করে, সুফলা-দি, আপনি এবার বিয়ে করুন—আর কত দিন অনিশ্চিতের আশায় বসে থাকবেন। তার সুখের জীবন দেখে সুফলা তৃপ্তি পায়, কিন্তু তার ছেলেমানুষি অনুরোধে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার স্কুলের সাথী, কলেজের সঙ্গিনী, সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গেছে, যাদের আজও হয় নি, দুদিন পরে হবার তাদের আশা আছে। আর তার? আত্মীয় বন্ধুর সকল স্নেহবন্ধনের বাইরে, জীবনের সব সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সকল রূঢ়তা তাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে।

তাদের সমাজে আর পাঁচটা মেয়ে যে ভাবে জীবন আরম্ভ করে, সেও সেইভাবেই করেছিল, তারপর গানে, বিদ্যায়, রূপে সামাজিক ভব্যতায় সে অনেককে ছাপিয়ে উঠে বহু অবিবাহিতা মেয়ের মায়েদের হিংসার কারণ হয়ে উঠেছিল। কোন পার্টিতে সে না থাকলে তা যেন জমতো না—তার মন জুগিয়ে চলবার মত কৃতি তরুণের অভাব কোন দিনই হয় নি। তার ভবিষ্যত জীবনের উজ্জ্বল ছবিটি সর্ব্বদাই তার মা-বাপের চোখের উপর ভেসে থাকতো, এবং সেও গুঞ্জন করে হেসে, দাঁত চেপে কথা ব'লে, আঁচল দুলিয়ে, হাই-হিল জুতো প'রে, সারা শরীর ছন্দে দুলিয়ে নিজের জীবনের যে ছবি কল্পনায় আঁকতো, তার মা-বাপের ছবির তুলনায় তা কিছু কম উজ্জ্বল বা মধুর ছিল না। প্রথম যে ভাবে পত্তন হয়েছিল, শেষ যে তার এ রকম দাঁড়াবে—সে কথা কি সে দিন কেউ ভাবতে পেরেছিল?

বাপ-মা'র কথা মনে হতেই সুফলার চোখ দুটো ছলছল করে এলো—যাঁদের অসীম অনাবিল স্নেহের রসে তার বাল্য কৈশোর মধুময় হয়েছিল, সামান্য মতান্তরেই ঠুনকো জিনিষের মত সে রসসম্পুট যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, সে কথা ভাবতেও আজ যেন তার বুক টনটন করে ওঠে।

কিন্তু যার জন্যে, আজন্ম সুখ বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়েও দুদিনেই সে সব ত্যাগ করে মোটা খদ্দর ধরলে, বাপ-মা'র অনাদর উপেক্ষাও ভালিও মাথায় তুলে নিলে—সে শঙ্করই বা আজ কোথায়? যার পাশে দাঁড়াবার জন্যে সে সব ছেড়ে এসেছিল—আজ তাকে পাশে পেলে জীবনের সব রিক্ততাই যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ হয়ে যেত! সে যে কোথায় সুফলার তা জানা নেই, জানবার কোনও সম্ভাবনাও নেই। বাংলার যে শতাধিক যুবক, সুদূরে লোকচোখের অন্তরালে নির্ব্বাসনে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে, সুফলার শঙ্কর তাদেরই একজন!

অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যে বছর সারা ভারতবর্ষ টলমল করছিল, সারা দেশের সহস্র সহস্র লোক যেদিন হাসিমুখে কারাবরণ করে রাজশক্তির হাতে নির্য্যাতিত হয়েও অদূরবর্ত্তী স্বরাজের আশায় উৎফুল্ল হয়ে দিন কাটাচ্ছিল, সুফলা সেবার ম্যাটরিক পাশ করে কলেজে ভর্ত্তী হোল। এ আন্দোলন তাদের জীবনের গতি একটুও বদলায় নি, আগের মতই কলেজ করে পার্টি দিয়ে দেশ বেড়িয়ে তারা আনন্দে দিন কাটিয়ে যাচ্ছিল—শুধু তাদের একটি কাজ বেড়েছিল—সেটি স্বাধীনতা-পথের যাত্রীদের উপর গালিবর্ষণ। সুফলা বাপ ভাই আত্মীয়দের কথা শুনতো, এবং কলেজে খদ্দর-পরা মেয়েদের দিকে একটা অনুকম্পামিশ্রিত ভাবে চাইত। তার আবাল্য বন্ধু সবিতার কাপড়ের দিকে চেয়ে হুজুকে, ঢঙী ইত্যাদি মিষ্ট মধুর বাক্য শোনাতেও তাকে কসুর কোরত না।

তারপর দু বছর পরে সুফলা যেদিন আই, এ, পাশ করে বেরুলো, দেশের অবস্থা তখন রাতের প্রবল ঝড়ের

পর শান্ত প্রভাতটির মত—আন্দোলন হ্রাস পেয়েছে, নেতার দলে মতান্তর মনান্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাউন্সিল যাত্রীর দল তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী। এই সময় শঙ্করের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ।

২

ক্রমে ক্রমে গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে রোদ বয়ে এসে বাগানটিকে ছেয়ে ফেলতেই মেয়েরা স্নানের চেষ্টায় উঠে পড়লো। দূরে রাজপথ তখন গাড়ী ঘোড়া ট্রামের শব্দে মুখরিত। খানিকটা রোদ সুফলার পায়ের কাছে এসে পড়েছিল, সুফলার এ সব কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না—সে তখন নিজেকে গত জীবনের চিন্তার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে।

সেদিন ভবানীপুরের একজিবিসনে সুফলা তার ছোট দাদা কিংশুকের সঙ্গে ষ্টলে ষ্টলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সামনের একটা কাপড়ের দোকানে ভায়োলেট রং-এর ক্রেপের সাড়ী দেখে সে ঢুকে পড়লো।

'আজকের দিনেও আপনারা বিলিতি কাপড় কিনলেন'—পিছনে বিনীতস্বরে এই ক'টা কথা শুনে সুফলা চমকে ফিরে চাইলে—ছিপছিপে লম্বা, চাঁপা রং-এর খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা, একটি ২৬।২৭ বছরের ছেলে তার দাদা কিংশুককে এই কথা বল্লে। অযাচিত ভাবে উপদেশ দেবার অধিকার যে তার একটুও নেই এ কথা তার দাদা লোকটিকে এখুনি জানিয়ে দেবে, এই মনে করে তার ভাইয়ের দিকে চাইলে।

কিংশুক কিন্তু অল্প হেসে লোকটিকে বল্লে, আমরা ত আপনাদের দলের নই শঙ্কর বাবু।

শঙ্কর বল্লে, আমাদের দলের না হলেও, দেশের ত। আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক আশা করি। তারপর সে সুফলার দিকে চেয়ে বল্লে, মেয়েরাও যখন দেখি আজকের দিনে নতুন করে বিলিতি কাপড় কিনছেন, তখন কষ্টবোধ না করে পারি না, অযাচিত ভাবে আপনাকে এ কথা বল্লুম বলে আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন।

খদ্দরভক্তদের প্রতি তার অভ্যস্ত শক্ত কথাগুলো বলতে গিয়ে সুফলা হঠাৎ থেমে গেল—আশ্চর্য্য! মানুষের চোখ এত উজ্জ্বল।

কিংশুক বল্লে, আমার বোন বেবি যে খদ্দর পরতে পারে না—যে মোটা! মেয়েরা অনেকে আজকাল বাইরে পরেন বটে, তবে সে শুধু লোক দেখাবার জন্যে।

শঙ্কর সুফলার মুখের উপর চট করে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কিংশুককে বল্লে, মোটা? আজকাল বাজারে পাতলা সৌখিন খদ্দরের সাড়ীরও অভাব নেই। আপনার ঠিকানাটা বলুন কিংশুক বাবু—আমি কালই সাড়ী নিয়ে যাবো, আর আমারও বিশ্বাস উনি সেগুলো অপছন্দ কোরতে পারবেন না।

কিংশুক এবার বিব্রত হয়ে সুফলার দিকে চাইলে। মৌখিক সামান্য পরিচয় থাকা সত্ত্বেও একে বাড়ীতে ডাকা অসম্ভব—কারণ এ রকম মার্কা মারা স্বদেশীওলার আবির্ভাবে তার মা বাপের কোপে পড়বার পূর্ণ সম্ভাবনা, অথচ একে কিই বা বলা যায়। সুফলা কিন্তু সহজভাবেই বল্লে, ওঁকে আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে দাও না ছোড় দা।

কিংশুক গাড়ীতে বসে বল্লে, আশ্চর্য্য লোকটি কিন্তু বেবি। আমরা কি করে দিন কাটাচ্ছি, আর ওই বা কেমন করে কাটাচ্ছে দেখ্, অথচ আমাদের চেয়ে ও কিছু কম সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে নয়। কলেজে কিছুদিন ওর সঙ্গে পড়েছিলুম, সামান্য মুখ চেনা আছে, কিন্তু ওর মুখে আর ব্যবহারে এমন একটা বিশিষ্টতার ছাপ আছে, যা আমার দেখলেই ভাল লাগে।

ভাইয়ের কথার উত্তরে সুফলা শুধু ঘাড় নেড়ে বল্লে, হুঁ। তার চোখের সামনে তখন অপরিচিত লোকটির কালো ঘন চুল, জলজলে দুটো চোখ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ শান্ত সৌম্য মুখটি ভেসে উঠছিল। সে মুখের পাশে তার পাণিপ্রার্থী অনেক যুবক এমন কি কল্যাণ মুখার্জ্জীর চেহারাও যেন ক্রমশঃ মিলিয়ে আসছিল।

পরদিন বিকেলে সুফলা চুল বাঁধতে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় কিংশুক ঘরে ঢুকে খাটের উপর একটা প্রকাণ্ড বাণ্ডিল ফেলে দিয়ে বল্লে, ওরে বেবি, শঙ্কর কাপড় দিয়ে গেল। কোথায় মিটিং-এ তাকে বক্তৃতা দিতে হবে, তাই

ছেড়ে দিলুম—নইলে আজই বাবার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতুম। সাড়ীগুলো তুই দেখে রাখিস্, কাল আবার সে আসবে। আমারও ভাই ওর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। তোরও খুব ভাল লাগবে ওর সঙ্গে মিশলে।

ভাল যে সুফলার লাগে নি তা নয়—শঙ্করের কথা তার অনেকবার মনে উঠেছে—কলেজে কয়েকবার সবিতার কাছে অন্যমনস্ক ভাবে তার নাম করে তাকে ঠাট্টা করবার সুযোগও সে দিয়েছিল।

শঙ্করের সঙ্গে আলাপ হবার পর সুফলার বাবার তাকে বড় ভাল লেগে গেল। কিংশুকের অনুরোধে শঙ্কর প্রায়ই সে সময় সুফলাদের বাড়ী আসত। কিন্তু যে দিন থেকে সুফলা খদ্দরের সাড়ী পরতে সুরু কোরলে, সে দিন থেকেই যেন সকলে শঙ্করের উপর মনে মনে বিরূপ হয়ে উঠলেন, আর সন্ধ্যার সময় ড্রয়িং রুমে স্বদেশীওলাদের ওপর কল্যাণের আক্রমণটা আগেকার চেয়ে দিন দিনই অকারণে তীব্র হয়ে উঠলো—মাঝে মাঝে কিংশুক এবং শঙ্করের সঙ্গে তার প্রবল বাকযুদ্ধও বেধে উঠতো।

এদিকে সুফলার উপর কল্যাণের মনোযোগ যেন দিন দিনই বেড়ে চল্লো।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুফলা বাড়ীতে একা ছিল। কয়েক দিন আগে তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। স্বরলিপি সামনে খুলে রেখে সে তখন অর্গানের সাহায্যে গাইছিল—

"যেদিন ফুটল কমল, কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে,
আমার সাজিয়ে সাজি, তারে আনি নাই
সে যে রইল সঙ্গোপনে।"

বাইরে জুতার মশ মশ শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল—গান বন্ধ করে সুফলা পিছন ফিরে চাইতেই সে সহাস্য মুখে বল্লে, চমৎকার, সন্ধ্যাটা যে আপনি মুখর করে তুলেছেন! থামলে হবে না মিস্ ব্যানার্জ্জী, চলুক। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সে সুফলার সামনে বসে পড়লো। আরম্ভ করুন, আরম্ভ করুন। সুফলা কুণ্ঠিত হয়ে উঠলো—সে বল্লে, আজ থাক—আর একদিন।

না, না সে হবে না—এ নতুন গানটা আমাকে শোনাতেই হবে।

গানটা শেষ করে সুফলা বল্লে, আজ বাবা মা কেউ বাড়ী নেই, বাবা লজে, মা বালিগঞ্জে মাসিমার বাড়ী। তার আশা ছিল কল্যাণ এর পর উঠে যাবে। কিন্তু সে চেপে বসে বল্লে, হাঁ সে আমি জানি। কোর্টে মিঃ ব্যানার্জ্জী বলছিলেন, 'বেবিটা বিকেলে একা থাকবে, সুবিধা হয় ত তুমি যেয়ো।' তার পর সে নানারকম গল্প সুরু কোরলে।

কিংশুক সেদিন শঙ্করের সঙ্গে কোন একটা মিটিং-এ গিয়েছিল—সুফলা আশা করেছিল যে, তারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবে—তাদের আসার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল দেখে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। এই সময় কল্যাণ তাকে বল্লে আপনার ত পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল—এবার কি কোরবেন ঠিক কোরেছেন মিস্ ব্যানার্জ্জী?

সুফলা বল্লে, এখনও কিছু ঠিক করি নি, তবে বড়-দা ত বিলেত থেকে লিখেছে এম, এ,-টাও পড়ে নিতে।

কল্যাণ একটু চুপ করে থেকে বল্লে, কিন্তু—আমায় আর কতদিন এ উদ্বেগের মধ্যে ফেলে রাখবেন?

সুফলা চমকে উঠলো—এই রকম একটা কিছুর আশঙ্কা তার মনে জাগছিল। কল্যাণের দিকে একবার চেয়ে সে মুখে নীচু কোরলে।

কল্যাণ আবার বল্লে, বলুন মিস্ ব্যানার্জ্জী, আমি যে অনেক দিন থেকে আশায় রয়েছি।

সুফলা স্বরলিপির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বল্লে, আমায় মাপ করুন মিঃ মুখার্জ্জী।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণ তার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর বল্লে, কিন্তু মাস কয়েক আগেও ত আপনার কথার ভাবে আমি আশা পেয়েছিলুম।

অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে সুফলা বল্লে, যদি আপনাকে

ভুল বোঝবার অবসর দিয়ে থাকি, তাহলে আমায় ক্ষমা কোরবেন—আমি তখন নিজের মন বুঝতে পারি নি।

কল্যাণের মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠ্‌লো। দাঁত দিয়ে ঠোঁট সজোরে চেপে সে বল্লে, ওঃ তা হলে মনটা আপনি বোধ হয় বুঝেছেন, যদি ভুল না করে থাকি,—ঐ ভণ্ড স্বদেশীওলার আবির্ভাবের কিছু পর হতেই, কেমন?

সুফলার মুখ মুহূর্ত্তেই লাল হয়ে উঠ্‌লো—কল্যাণের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে সে বল্‌লে, সে কথা জানবার আপনার কোন অধিকার নেই মিঃ মুখার্জ্জী।

কল্যাণ হা হা করে হেসে উঠলো। বল্‌লে, ঠিক বটে, তবে আপনার নির্ব্বাচনের শক্তি দেখে আমার হাত তালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। প্রত্যাখানের লজ্জায় ও পরাজয়ের অপমাণে কল্যাণ আপনাকে ভুলে শঙ্করকে তীব্র ভাবে গাল দিতে সুরু কোরলে, ঐ একটা গেঁয়ো লোক, মোটা নোংরা কাপড় পরা, লেখা পড়া ছেড়ে রাজ্যের ছোট লোক ধোপা মেথরের ছেলেদের নিয়ে স্কুল করে, আর বাজে লেকচার দিয়ে বেড়ায়, ঐ হোল কিনা আপনার হিরো। দেশ দেশ করে বেড়ায় অথচ মেয়েদের—

রাগে সুফলার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল—সে তাকে বাধা দিয়ে বল্লে, কোন ভদ্রলোকের অসাক্ষাতে তাকে গাল দেওয়া কোন্ দেশী ভদ্রতা তা জানি না—তবে সব সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে যারা দেশের কাজে নামে, তারা ভণ্ড—না পরের ধার করা আদব কায়দায় যারা চলে তারা,—সেটা বিচার করে দেখবেন। পরের অনুকরণে আর ধার করা জিনিষে চিরদিন চলে না—এবার এসব ছাড়বার সময় এসেছে মিঃ মুখার্জ্জী।

কল্যাণ যেন নিজেকে সামলে নিয়েছিল—লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে সে বল্লে, কিন্তু এই ধার করা সভ্যতার মধ্যেই আপনিও ত মানুষ হয়েছেন, মেনে নিয়ে দিব্যি চলছিলেনও, কিছুই কোনদিন মনে হয় নি—হঠাৎ এতদিন পরে একটা দিশী—ভারতীয় জীবনধারা আপনি আবিষ্কার কোরে ফেল্লেন দেখছি যে।

সুফলা সংযত কণ্ঠে বল্লে, হাঁ, ভুল আমি করেছিলুম, এখন শুধরে নিচ্ছি, ভুল যে করে শুধরে নেবার অধিকার তারই আছে। আমি আপনাদের এই সভ্যতার মধ্যে আর শান্তি পাচ্ছি না—আমায় ক্ষমা কোরুন।

কল্যাণ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো—তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, এই কি আপনার শেষ কথা? আমি কি আর কিছুই আশা কোরব না? একটা সযত্ন-পোষিত আশাভঙ্গের ব্যথা যেন তার কণ্ঠে স্পষ্ট বেজে উঠ্‌লো।

সুফলার বুক ঠেলে কান্না আসছিল—মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে তাকে শক্ত কথা বলে ফেলেছে—সে জন্যে তার ভারি লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সে কি করবে—আর কিছুদিন আগে কল্যাণকে সে সাগ্রহে ও সানন্দে বরণ করে নিতে পারত, কিন্তু... সেই উজ্জল চোখ দুটি! তারা যে তাকে সব ভুলিয়ে দেয়।

কল্যাণ উঠে দাঁড়াল। সুফলার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে, আচ্ছা চল্লুম তবে, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা সত্য করে আমায় বলুন, মিঃ চৌধুরীকে আপনার কি সত্যই এত ভাল লেগেছে? সুফলা মুখ তুল্লে না, কল্যাণ বল্লে, আচ্ছা বিদায়! বিদায়—মিস্ ব্যানার্জ্জী।

বাইরে জুতোর শব্দ মিশিয়ে যেতে না যেতেই সুফলার দুচোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়লো—কল্যাণের ম্লান মুখখানার কথা তার বার বারই মনে আসছিল—তাকে প্রত্যাখ্যান কোরে সে কি ভাল কোরলে? ভবিষ্যত জীবনের যে উজ্জল ছবি সে এঁকে রেখেছিল সে ছবি যে আজ সে নিজে হতেই মুছে দিলে। তার বাপ-মা-ই বা কি বলবেন? আর শঙ্কর? তার মনের ভাব ত সে কিছুই জানে না। সুফলা নিজেই অবাক হয়ে যায়—এক নিমেষে মাত্র একটা চোখের দৃষ্টিতে কি করে তার মনের মাঝে এত ওলট পালট হয়ে গেল—এতদিনের অভ্যাস সংস্কার সে কেমন করে কাটিয়ে ফেলেছে, পূর্ব্ব জীবনের সে আমোদ সুখের মধ্যে আর ত তার থাকতে ইচ্ছে করে না···

কল্যাণকে প্রত্যাখ্যান করায় বাড়ীতে হুলুস্থুল বেধে গেল। সুফলার বাবা নিতান্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন—মায়ের

কাছে সে অনর্থক শঙ্কর কথা শুনতে লাগলো—শঙ্করের সম্বন্ধে শ্লেষ করে কথা বলতেও তিনি ছাড়লেন না। সে এম-এ পাশ করা, জমিদারের ছেলে হতে পারে, কিন্তু তার মত স্বদেশীওলা ও জেল-ফেরত কয়েদীর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ হওয়াই যে বাঞ্ছনীয়, সে কথাও সুফলার কানে গেল।

সেদিন দোতলার ঘরের জানলার পর্দ্দা একটু ফাঁক করে সুফলা সন্ধ্যার আকাশের পানে ম্লানমুখে চেয়েছিল। নীচের বাগান দিয়ে যেতে যেতে শঙ্কর তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল—আর সন্ধ্যার আলো-আঁধারের মাঝে তার দীপ্ত চোখ দুটি ক্ষণেক সুফলার মুখের উপর তুলে ধরে অনেক দিনের অকথিত বাণী যেন তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল। সুফলা শিউরে উঠলো...কিন্তু শঙ্কর—সে অমন করে চলে গেল কেন।...রাত্রে আলো নিবিয়ে সুফলা শুতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে কিংশুক ডাকলে, বেবি, ঘরে আসবো?

সুফলা ঘরের পর্দ্দা সরিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এলো—তার মুখ ম্লান-গম্ভীর। সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েই বল্লে, বেবি শুনেছিস্, বাবা শঙ্করকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ কোরেছেন—কল্যাণ নাকি তোদের দুজনের নামে কি সব বলেছে। শঙ্করকে যে এ অপমানটা সহ্য করতে হলো তার জন্য দায়ী আমি—কারণ সব জেনেও আমিই ত তাকে এ বাড়ীতে এনেছিলুম আর সে মুখ বুঁজে সব সহ্য কোরলে কেন জানিস? শুধু তোরই জন্যে। কিংশুক পূর্ণ দৃষ্টিতে সুফলার দিকে চেয়ে দেখলে। সুফলার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো, তার কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ কোরছিল—ভাইয়ের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে সে আর তার দিকে চাইলে না।

কিংশুক একটু চুপ করে আবার বল্লে, এই আজ এতক্ষণ আমরা দুজনে মাঠে বসেছিলুম—কত কথা হোল। আমার সঙ্গে সেও জর্ম্মাণী যাবার পাস-পোর্ট নেবে বলছিল।

সুফলা অত্যন্ত আগ্রহে এবার মুখ তুল্লে, কিন্তু তাঁর কাজ? সে সবের কি হবে?

কিংশুক বল্লে, আমিও তাকে সে কথা বলেছিলুম—তুমি যে এত আড়ম্বর করে নাইটস্কুল, চরকা তাঁতের কারখানা ইত্যাদি আরম্ভ করেছ, এসব ছেড়ে দিয়ে জর্ম্মাণীতে এখন ডিগ্রী নিতে গেলে লোকে তোমায় হিপোক্রীট বলবে শঙ্কর। তার উত্তরে সে বল্লে, লোকে যা বলে বলুক—তবে আমার অভাবে কাজ আটকাবে না—আমার একটা বিদেশী ডিগ্রি থাকলে, কিংবা অন্তত বিলেতটা একবার ঘুরেও এলে তোমার বাবার বোধ হয় তোমার বোনকে আমার হাতে দিতে কিছু আপত্তি হবে না—আমি তাই যাবো। জীবনে প্রিন্সিপ্যালকে সব চেয়ে বড় বলে ধরে রেখেছিলুম আজ জানছি তার চেয়েও বড় জিনিষ আছে ভাই। কোন যোগ্যতা না থাকতে যা পেয়েছি, তাকে মাথায় করে রাখবো—তোমাদের আমাদের মাঝের ব্যবধান আমি নিজেই ঘুচিয়ে দেবো: কাল পাস-পোর্টের জন্যে লিখবো, আর বাবাকেও জানাব। বাজে খেয়াল ছেড়ে এবার আমি মানুষ হচ্ছি দেখে তিনিও খুশী হবেন।

সুফলার ভয়ানক কান্না আসছিল। দাদার সামনে যতই সে সংযত হবার চেষ্টা কোরছিল, ততই যেন তার দুচোখ ছাপিয়ে জল আসছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কিংশুক উঠে দাঁড়াতেই সুফলা হঠাৎ তার হাতখানা চেপে ধরে বল্লে ছোড়-দা, তুমি বলো কল্যাণ বাবুকে প্রত্যাখ্যান করে আমি কি বড় অন্যায় করলুম? বাবা, বড়দা, মা, সকলেই আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

কিংশুক তার মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, না বেবি, অন্যায় তুমি করো নি—শঙ্করকে তোমরা কেউই ভাল করে চিনতে পারো নি—সে একটা আসল মানুষ। আমারও মনে হয়, নকলের জাঁকজমকে ভুলে সুখী হওয়ার চেয়ে আসলকে বরণ করে দুঃখ পাওয়ায়ও সুখ আছে ঢের—বাবা দাদা বিরক্ত হন হবেন—ভয় কি? নিজের উপর ভরসা রেখ—তার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে কিংশুক বেরিয়ে গেল।

সুফলা যেদিন কিংশুকের কাছে শুনলে যে, তাদের বাড়ীতে আগের মত নিয়মিত আসবার জন্যে তার বাবা অনুরোধ করা সত্ত্বেও কল্যাণ মিস্ রায়কে নিয়ে বাইরে খুব ঘুরছে, সে দিন সে একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলে বাঁচলে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই যখন তার বাবা সদ্য বিলাত প্রত্যাগত, বন্ধুপুত্র নীহাররঞ্জনকে ধ'রে এনে কল্যাণের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন সুফলার দুর্ভাবনার আর অন্ত রইল না। নীহারকে এড়িয়ে চলবার কোন চেষ্টাই তার সফল হোল না—মনের সমস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গানে গল্পে নতুন অতিথির পরিতুষ্টির ভার তারই উপর পড়লো।

সেদিন রাত ন'টা অবধি গানগল্প ক'রে নীহারকে বিদায় দিয়ে অবসন্ন দেহমনে সুফলা শুতে যাচ্ছে, এমন সময় কিংশুক এসে জানালে যে, শঙ্করকে পুলিশ থেকে পাসপোর্ট দিলে না। সুফলা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, দিলে না? কেন ছোড়্‌দা? কিংশুক বল্লে, ওঁর উপর পুলিশের দৃষ্টি নাকি বরাবরই ছিল, নতুন আন্দোলনেও ওঁর নামে নাকি অনেক রিপোর্ট আছে। সুফলা আর কোন কথা বলতে পারলে না—অপ্রত্যাশিত আশাভঙ্গের ব্যথায় তার সারা দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পরদিন সকালে তার মা তাকে কাছে ডেকে এ-কথা সে-কথার পর সস্নেহে বল্লেন, নীহারকে ত তোর ভাল লেগে গেছে দেখছি বেবি, সেও আমার কাছে তোর খুব প্রশংসা কোরছিল। বড় ভাল ছেলেটি বাপু, তোদের দুহাত এখন নির্ব্বিঘ্নে এক হয়ে গেলে আমরা বাঁচি বাছা।

মায়ের এই স্পষ্ট কথায় সুফলা প্রথমটা চমকে উঠ্‌লো, —তারপর অবিচলিত কণ্ঠে তাঁকে জানিয়ে দিলে যে, শুধু নীহারকে কেন, সে কারুকেই বিয়ে কোরবে না।

সুফলার কথায় কান না দিয়ে তার মা তাকে বারবার বোঝালেন কল্যাণকে প্রত্যাখ্যান করে সে অত্যন্ত অন্যায় কোরছে, এবার তার প্রতিকার করা দরকার, এবং সেটা যত শীঘ্রই হয়, তত তা সবায়ের পক্ষেই মঙ্গল—সুফলা কিন্তু অচল। তার মা শেষে রাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা তার বাবার লাইব্রেরীতে সুফলার ডাক পড়লো। সশঙ্কচিত্তে সে ঘরে ঢুকতেই তার বাবা গম্ভীর ভাবে তাকে বল্লেন, সুফলা, তুমি বড় হয়েছ, চারদিক নিজে ভেবে দেখে কাজ কোরতে তুমি এখন শিখেছ, আমি আর তোমার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাই না। নিজের জেদে চ'লে বাইরের লোকের সামনে আমাকে অপদস্থ করতে তোমার যদি দ্বিধা না থাকে তবে তোমায় স্বাধীনভাবে বাইরে থাকাই ভাল—তোমায় মত অবাধ্য মেয়ের স্থান আমার বাড়ীতে নেই—এখানে থাকতে হলে নীহারকে তোমায় বিয়ে কোরতে হবে। কথা শেষ করে একখানা মোটা বই খুলে তিনি পড়তে বসলেন।

সুফলা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল—শাস্তি! এত বড় শাস্তি তার বাবা তাকে দিলেন। এত দাম দিয়ে তাকে তার জন্ম-নীড়ে থাকবার অধিকার লাভ কোরতে হবে? —না, সে বাইরেই যাবে। কিন্তু অচেনা অজানা জায়গায় সে পা বাড়াবে কেমন ক'রে? বাইরের জগতে কত বিপদ আপদের সম্ভাবনা, সেও তা জানে। এই নিশ্চিন্ত আরামের নীড় ছেড়ে সে যাবে কোথায়? একলা সে বাইরে স্বাধীনভাবে দাঁড়াবে কোন্ সাহসে? ভয়ে তার সারা শরীর শিউরে উঠ্‌লো—মনে হল, বাবাকে একবার বলে, বাবা, আমায় ক্ষমা করো তোমার কথা শুনেই চলবো —কিন্তু সন্ধ্যার ম্লান আলো-আঁধারে সেই দুটি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি! মুহূর্ত্তেই সুফলার মন শক্ত হয়ে উঠ্‌লো—দাঁত দিয়ে শক্ত করে ঠোঁট চেপে সে মায়ের দিকে চাইলে—দুটি চোখ তাঁর ছলছল কোরছে—স্বামীকে তিনি চেনেন—তাঁর কথার উপর কথা কওয়া বৃথা! বাপের দিকে সুফলা চাইলে—সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে তিনি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

নিজের ঘরে নিভৃতে সারারাত চোখের জলে সে শুধু এই কথা মনে করেছে—যেতে হবে—তাকে যেতে হবে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে মা'র মুখে সব কথা শুনে কিংশুক সুফলার কাছে এলো। সুফলা কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ তখন রাঙা করে তুলেছে। তার দিকে একবার চেয়ে দেখে কিংশুক অনেকক্ষণ মাটীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে চেয়ারে ব'সে রইলো—তার পর মুখ তু'লে বল্লে, তোর যে কি হবে বেবি, আমি তা ভেবে পাচ্ছি না। শঙ্করেরও বাইরে যাবার আশা মোটেই নেই, ওকে

পাসপোর্ট দেবে না নিশ্চয়ই। আর যার উপর পুলিশের এত দৃষ্টি তাকে বিয়ে করাও খুব মুস্কিলের কথা—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কি যে হবে, আমিও আবার এ সময় চলে যাচ্ছি।

সুফলা বল্লে, আমার কথা ভেবে মন খারাপ কোর না ছোড়্-দা, অদৃষ্ট আমায় যে পথে নিয়ে যাবে, অন্ধভাবে সেই দিকেই যেতে হবে, উপায়ও কিছু নেই। দুঃখ আমার কপালে অনেক আছে নইলে মুহূর্ত্তে আমার জীবনের ধারা কেন উল্টে গেল বলো। কিন্তু এ বাড়ীতে আমি আর থাকছি না। তার চোখের জল আর বাধা মানলো না।

কিংশুক বিস্মিত হয়ে বল্লে, থাকবি নে ত যাবি কোথায়?

আমি কাজ নেবো।

কিংশুকের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। সে বল্লে, তুই কাজ নিবি, কি বলছিস্ পাগলের মত? তুই কাজ নিলে বাবার আর তোরও সমাজে কত অপমান হবে জানিস্?

সুফলা বল্লে, তাহলে কি তুমি আমায় নিজেকে বলি দিতে বলো? সে আমি পারবো না। বাবাকে ত তুমি জানই—আর তুমিই ত একদিন আমাকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বলেছিলে, আমি তাই দাঁড়াব। তুমি শুধু যাবার আগে আমায় একটা ভাল জায়গায় বসিয়ে দিয়ে যাও ভাই, আমাকে ত সকলেই ত্যাগ করেছে—শেষের দিকে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এলো।

তারপর ছ'মাস কেটে গেছে। কিংশুককে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে সুফলা নিজেকে স্কুলের কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে। অচেনা সেই জায়গাটিই কিছুদিনের মধ্যে তার যেন চিরপরিচিত হয়ে দাঁড়ালো।

শঙ্করের সঙ্গে তার সবিতার বাড়ী প্রায়ই দেখা হোত। প্রথমটা অত্যন্ত সঙ্কোচে সে তার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারত না, পরে যখন আলাপ জমে গেল, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কথায় বার্ত্তায় কেমন ক'রে কেটে যেতো, তা তারা দুজনেই বুঝতে পারতো না। আজ এতদিন পরেও সে কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে, শঙ্কর তাকে কতদিন বলেছে, শঙ্করের সে শান্ত স্বর আজও যেন তার কানে বাজে, "বেবি, তোমার মত হাসিমুখে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করে নিতে পারে, এমন মেয়ে আমি কখন দেখি নি, আর এমন মেয়ে যে হতেও পারে, তা তোমাকে দেখবার আগে অবধি আমি ধারণা কোরতেও পারি নি। তোমার এ আত্মত্যাগের কথা সারাজীবন আমায় তোমার যোগ্য হবার জন্য উদ্বুদ্ধ কোরবে। শঙ্করের চোখের সে দৃষ্টি, তার মুখের এই কথায় সুফলার ছোট মুখখানি গর্ব্বে ভ'রে উঠ্‌তো—সে মুখে কিছু বলতো না, শুধু শঙ্করের হাতখানি জোরে চেপে ধ'রে সে তার মনের গোপন কথা তাকে জানিয়ে দিত।

শঙ্করের কথায় সে কত সান্ত্বনা, কত সাহসই না পেতো! শঙ্কর বলতো, বিধাতার মঙ্গল বিধানে যে দুটি আত্মা পরস্পরের কাছাকাছি আসে, তাদের সে বন্ধন সারাজীবনের মতই। জীবনে ঝড়ঝাপটা বারবারই আসে, কিন্তু নিজেদের রক্ষা করবার আর সে জন্যে মরবারও যদি সাহস থাকে, তাহলে কোন কিছুই তাদের দুজনকে পৃথক করতে পারে না। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা কখন কাছাকাছি আসে, কখন বা দূরে চলে যায়, সে শুধু ঝড়ের খেলা; কিন্তু মানুষের জীবন ত এমন অর্থহীন খেলা নয়।

সুফলা তার কথা সব শুনতো—আর বোর্ডিং-এ ফিরে গিয়ে ভাবতো, শঙ্কর কত বড়! যতখানি সে ভেবে রেখেছিল তার চেয়ে সে কত বড়! কত উদার! শঙ্করের কথা চিন্তায় সে দিনের পর দিন যেন স্বপ্নের মাঝে কাটিয়ে দিত!

কিছুদিন পরে জর্ম্মাণী থেকে কিংশুকের চিঠি পেয়ে শঙ্কর যখন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কোরলে—সে কালবিলম্ব না করে সম্মতি দিয়ে দিলে—সে যেন তার কাছ থেকে আর দূরে থাকতে পারছিল না।

তারপর সবিতা যখন কোমর বেঁধে বন্ধুর বিয়ের জোগাড় করছিল, আর সুফলাও শঙ্করের পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে, সুখকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছে মনে করে অসীম তৃপ্তি বোধ করছিল, ঠিক সেই সময়ই একদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল—

লোক-চোখের অন্তরালে নতুন আইন তৈরী করে ভোর রাতে পুলিশ সারা বাংলা দেশে হানা দিয়ে শতাধিক যুবককে জেলে পুরেছে আর শঙ্কর তাদেরই একজন।

সুফলার মাথা ঘুরে গেল। অদৃষ্টের একি পরিহাস। জীবনকে সে যতবারই আঁকড়ে ধরতে গেল—জীবন কি ততবারই তাকে নির্ম্মমভাবে দূরে সরিয়ে দিলে।

ঢং ঢং করে সজোরে বোর্ডিং-এ, মেয়েদের খাবার ঘণ্টা বেজে উঠতেই সুফলা চমকে উঠ্‌লো। অদূরে গির্জ্জার ঘড়ির দিকে চেয়ে সে অস্ফুট কণ্ঠে বল্লে,তাই ত। এত বেলা—তাড়াতাড়ি উঠে সে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো।

৩

পূজোর ছুটী।

মেয়েরা সব বাড়ী গেছে—শুধু আসন্ন পরীক্ষার্থিনী কয়েকটি মেয়ে বাড়ীতে গোলমালের মধ্যে পড়ার ব্যাঘাত ঘটবার ভয়ে বোর্ডিং ছেড়ে যায় নি। সুফলারও বাড়ী যাবার কোন তাড়া ছিল না। মেয়ে ক'টিকে তার তত্ত্বাবধানে রেখে স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্ গুহ গিরিধিতে গেছেন।

সেদিন সারা দুপুর মেয়েদের অঙ্ক বোঝাতে বোঝাতে সুফলার মাথা ধরে উঠেছিল। বারাণ্ডার মুক্ত বাতাসে মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে সে বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ছোট টেবিলের উপর বেতের টুকরীতে দরোয়ান প্রতিদিনের মতই মেয়েদের চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিল। সুফলা এক এক ক'রে সেগুলো পড়ে মেয়েদের জন্যে টেবিলের উপরই রেখে দিলে। সকলের শেষে তার নামে অপরিচিত হাতের ঠিকানা লেখা একখানা খাম, সে সে খানা চট্ করে তুললে। কিংশুক, সবিতা, আর তার মা ছাড়া কেউ ত তাকে চিঠি লেখেন না। তবে কে তাকে এ চিঠি লিখলে? তাড়াতাড়ি খামখানা সে ছিঁড়ে ফেল্লে—ইংরেজি পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা দু পৃষ্ঠা চিঠি। পাতা উল্টে নামটা সে প্রথমে দেখে নিলে—জেমস্ মারে। কে?

সে পড়লে—

সেণ্ট জেম্‌স্ চার্চ্চ,
নাগপুর

প্রিয় মহাশয়া,

আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও আপনাকে যে পত্র লিখতে সাহস করছি, সে জন্য আমাকে ক্ষমা কোরবেন। আমার বন্ধু মিঃ শঙ্কর চৌধুরীর কাছে আপনার কথা এতবার শুনেছি যে,আপনাকে আমার অপরিচিত বলে মনে হয় না; কিন্তু মিঃ চৌধুরীর অন্তিম অনুরোধে যে মর্ম্মান্তিক কর্ত্তব্য সম্পাদন কোরতে এ চিঠি লিখছি, সে জন্য আমি নিজেকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারছি না।

অন্তিম অনুরোধ! সুফলার সারা দেহে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল—তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো—আঁচলে চোখের জল মুছে সে আবার পড়লে—

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, আর আমি তাঁকে ভালবেসেছিলুম। বাঙালী, আর ভারতবাসী সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে আমি এ দেশে মিশনারী হয়ে এসেছিলুম, তা আমার আজকে বদলে গেছে। পরাধীন জাতের মধ্যে এমন স্বাধীন আত্মা তেজস্বী লোক থাকতে পারেন, তা আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়, তখন তিনি রোগশয্যায়। তার শীর্ণ মুখে দীপ্ত চোখ দুটি দেখে আমি তাঁর অন্তরের মানুষটিকে চিনেছিলুম, আর যেচে তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরেছিলুম। তিনি সে রোগশয্যা ত্যাগ কোরতে পারেন নি। এ দেশের জল হাওয়া, এবং অন্তরীন অবস্থায় খাওয়া দাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তন তাঁর সহ্য হয় নি—থাইসিস্ ধরে গিয়েছিল। গত বুধবার সকাল বেলা তিনি চিরবিশ্রাম লাভ কোরেছেন।

শরত প্রভাতের মত স্বচ্ছ, গোলাপের মত সৌরভময়, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল আত্মাটি অকালে চলে গেছেন। বাঙলাদেশ তাঁর জন্মভূমি যাকে তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন—সেইখানে শেষ নিশ্বাসটি ফেলবার তাঁর বড় সাধ ছিল—কিন্তু তাঁর সে শেষ ইচ্ছাটাও পূর্ণ হোল না।

যদি অনুমতি করেন তাহলে কলকাতায় গিয়ে একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরব—তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনাকে বলবার ভার তিনি আমায় দিয়ে গেছেন।

আপনার বিশ্বস্ত—জেমস্ মারে

চিঠিটা সুফলার হাত থেকে খসে মাটীতে পড়ে গেল—শূন্য দৃষ্টিতে সে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো—মর্মান্তিক বেদনায় তার রক্তস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কোন কথাই তার মনে এলো না, চোখে এক ফোঁটা জলও এলো না, সে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

খানিক পরে উমা খাতা পেন্সিল নিয়ে এসে ডাকলে, সুফলা-দি! সে কোন সাড়া পেলে না। সুফলার নিস্পন্দ ভাব ও উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে উমা তাকে দু' হাতে সজোরে নাড়া দিয়ে ডাকলে, সুফলা-দি, অ সুফলা-দি—

সুফলা ভয়ানক চমকে উঠ্‌লো এবং পরমুহূর্ত্তেই তার অবশ আড়ষ্ট দেহ উমার গায়ে ঢলে পড়লো।

দূরের কোন্ পূজা বাড়ীতে তখন সানাইতে বিজয়া দশমীর বিদায়ের করুণ সুর বেজে উঠেছে।

বহুদিন কেটে গেছে কিংশুক জর্ম্মাণী থেকে ঘরে এসে তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল; কিন্তু সে যায় নি। সে তাকে বলে, একটা অবলম্বন চাই ত ছোড়্‌দা—কি নিয়ে থাকি বলো। এই মেয়েদের মাঝেই জীবনটা আমার কাটিয়ে দিতে দাও।

সুফলা আজও বসে আছে, তার মাথার কালো চুল সাদা হয়ে আসছে, তার চোখে আর আগের দীপ্তি নেই, মুখে তার সে দৃঢ়তায় ছাপের বদলে একটা গম্ভীর প্রশান্তি ফুটে উঠেছে।

সারাদিন মেয়েদের মাঝে সে হাসি গল্পে কাটিয়ে দেয়, সন্ধ্যার সময় নির্জ্জন এই বাগানে বেঞ্চের উপর এসে বসে এই সময়টুকুই যেন সে তার প্রিয়তমের সান্নিধ্য পায়। কালো আকাশের বুকে ঐ যে তারাটি জ্বল জ্বল করে, তার মাঝে যেন শঙ্করের চোখের সস্মিত দৃষ্টি ফুটে ওঠে, জীবনে চলার পথে সে যেন তাকে পথ দেখায়।

সুফলা প্রতীক্ষায় বসে আছে। শঙ্কর তাকে একদিন বলেছিল, বিধির মঙ্গল বিধানেই তাদের আত্মা দুটি কাছাকাছি এসেছে, ঝড় ঝাপটা, মৃত্যু, রোগ, কিছুই তাদের আর পৃথক কোরতে পারবে না। সেই মিলনের আশায় সে ত বহুদিন কাটিয়েছে! আর কতদিন—আর কতদিন তাকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে?

তাই সে ভাবে।

বাঙলায় আবার শারদলক্ষ্মীর আগমন।

বর্ষা তাহার বিদায়-পথে গাঙের ধারে কাশ ফুলের শ্বেত উত্তরীয় উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শাপ্‌লা ফুলের হাসি, কল্‌মী ফুলের নীল চাহনি ঝলমল্‌ করিতেছে। নালের কুঁড়িগুলি শরতের বাতাসে তাঁহার পায়ের ধ্বনি শুনিবার আশায় কান পাতিয়া রহিয়াছে।

শারদ-প্রভাতে শেফালির স্তব গান; কদম্বরেণুর ঝরার উৎসব শুরু হইয়াছে।

কাঁচা ধানের মঞ্জরী, তরু-তৃণের শ্যাম অর্ঘ্য দুঃখিনী বাঙলা মায়ের আশীর্ব্বাদ লইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া। ক্ষেত ভরা ঝিঙা ফুলের পীত পতাকা; পদ্ম-বনে মধুকরার শানাই বাজে।

বাঙলার এই উৎসব দিনে সকলকে আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি।

———

এই আনন্দের দিনে আজ এক বৎসর পূর্ব্বেকার একটি দিনের কথা স্মরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। কল্লোলের আশ্বিনের সংখ্যা দেখিয়া রোগ-শয্যায় মৃত্যু-পথের দিকে চাহিয়া একটি তরুণ প্রাণ বড় আনন্দে দুলিয়া উঠিয়াছিল। রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখের সেই আশা-উৎসাহ ভরা হাসিটুকু আজও চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

তাহার এক সপ্তাহ পরেই ৮ই আশ্বিন ১৩৩২ গোকুলচন্দ্র নাগ দার্জিলিং-এ দেহমুক্ত হন্।

কল্লোল তাঁহার প্রাণের সমস্ত অবসাদ ও দুঃখকে যেন দূর করিয়া দিয়াছিল। প্রাণের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া যে দিন কল্লোল প্রকাশিত হইল সেইদিন হইতে গোকুলচন্দ্র মরণাবধি কল্লোলকে একেবারে জীবন্-মরণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিলেন। কল্লোল সকল মানবের সুখ-দুঃখের প্রবাহ লইয়া নির্ভয়ে অত্যাচার উৎপীড়ন ও দর্পের পাষাণ শিলায় আঘাত করিবে ইহা তাঁহার আশা ছিল। মনে হয়, আজ কল্লোলের যতটুকু সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া তাঁহার আরও আনন্দ হইত।

এক বৎসর আকুল প্রবাহের মত কাটিয়া গেল। আবার এমন দিন ফিরিয়া আসিল, যে দিনে কল্লোল তাহার এমনতর আরও কয়েকটি সেবককে হারাইয়া বসিয়াছে।

শোক করিয়া দুঃখ করিয়া তাঁহাদের ফিরিয়া পাইবার কথা নয়। তবুও মানুষের মন, ব্যাকুল আগ্রহে হারাইয়া যাইবার পথের দিকেই চাহিয়া থাকে। সেই প্রতীক্ষার

ভিতর যে আশা মানুষের অন্তরলোকে দীপ-শিখা জ্বালাইয়া রাখে তাহাই মানুষকে কর্ম্ম ও প্রেরণার পথে অনুপ্রাণিত করে। এই পথ চলারই আনন্দে আমরা অমৃত-লোকের সন্ধান পাইব।

গোকুল চন্দ্র নাগ

দুঃখ দৈন্যের নিত্যোৎসবের মধ্যে গোকুলের মুখে যে অসীম ধৈর্য্য ও তৃপ্তির উজ্জ্বলতা দেখিয়াছি, তাহা শরৎ-আকাশের মতই নির্ম্মল, অচঞ্চল।

বিদায়-বেলায় তাহার মুখে না-পাওয়ার কোনই খেদ্ ছিল না, যাহা পাইয়াছিল তাহাও যেন অতি সন্তর্পণে পৃথিবীর কাছে রাখিয়া গেল। তাহার জীবনে, যাহা পায় নাই তাহা পাইবার জন্য কোনও তাড়া ছিল না, যাহা পাইত তাহা লইয়াই তাহার মহাসুখ, তাহার ভিতর অতৃপ্তির বিলাপ ছিল না, সম্ভোগের চাঞ্চল্য ছিল না। সত্যই তাহার স্বভাবটি ছিল যেন একটি কাঁটায় ঘেরা ফুল।

মানুষ মৃত্যুর পরেও এই পৃথিবীতে নানা আকারে, নানাভাবে বাঁচিয়া থাকিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়া যায়, গোকুল পৃথিবী হইতে শেষ বিদায়ের লগ্নটিকে যেন কেবল যাবারই আয়োজনে ভরিয়া তুলিয়াছিল। এই দুনিয়ায় কোথাও কোনও মতে তাহার স্মৃতিটুকু বাঁচিয়া থাকুক্ এমন ইচ্ছার কথা তাহার মুখে কখনও শুনি নাই।

সেই যে মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন প্রবল ঝড়ের রাতে তাহার সঞ্চিত ব্যথা ও আনন্দের ঝাঁপিটি পর্য্যন্ত আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে এক মহাতৃপ্তিসাগরে ডুব্ দিল, তাহার পরে তাহার মুখে আর কোনও কথাই শুনি নাই।

আজ বারে বারে মনে হয়, পথিক বুঝি শরতের পথ বাহিয়া আবার আমাদের কাছে আসিয়াছে।

দিল্লী হইতে নিম্নের পত্রখানি পাই। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নাই, কারণ লেখক-বন্ধু যে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার একমাত্র উত্তর যে, কবি ও কবিতার সমালোচকের মধ্যে কোনও তুলনা চলে না। সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়েরই স্থান আছে কিন্তু তাহা একেবারে ভিন্ন। • কবি দান করেন, সমালোচক তাহা গ্রহণ করেন।

কবিতা অন্তরলোকের কথা, তাহা যে, কেহ যে রসে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। কবিতা অনুভূতি, তাহাকে যে কোনও সমালোচক যত ভাগে ইচ্ছা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত কল্লোল সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমাদের এখানে একটা কথা উঠেছে যে, কবি বড়, কি কবির সমালোচক বড়।

আমি বল্লুম, "কবি শ্রষ্টা—কবি inspiration-এর আনন্দে সৃষ্টি করেন। কবি দ্রষ্টা, তাঁর দৃষ্টির সামনে অতীতের এবং ভবিষ্যতের ঘোমটা খসে পড়ে—বর্ত্তমানে বেঁচে থেকেও তিনি বর্ত্তমানের অতীত। মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবধারা তাঁর কাছে ধরা পড়ে, তাঁর ভাষায় প্রকাশ হয়, জাতিকে তিনি গতানুগতিক পথ থেকে নবজীবনের পথে নিয়ে যান, বন্ধন থেকে মুক্তিতে নিয়ে যান। সমালোচক তাঁর কাব্যের পরিমাপ করেন মাত্র—ভালমন্দ বিচার করেন, বিশ্বসাহিত্যে সেই কাব্যের স্থান নির্দ্ধারণ করেন, কোন্ প্রেরণা থেকে কবি কোন্ কবিতার সৃষ্টি করেচেন তার গবেষণা করেন। কবি ব্যতীত সমালোচকের অস্তিত্বই নেই। কবির আছে initiative এবং potentiality দুই-ই, সমালোচকের কেবল মাত্র potentiality. কবি একাতেই একা সম্পূর্ণ, সমালোচক একা অসম্পূর্ণ। সুতরাং বন্ধু আমার argument-এ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বল্লেন, "আপনি execution-টাকে বড় করে দেখ্‌চেন কেন, ভাবটাকে দেখুন। কবি একটা বড় ভাবের দোলায়—যাকে আপনি inspiration বল্‌চেন—সৃষ্টি করেচেন। সমালোচকও যদি ভাবের দিক দিয়ে তত বড় না হতে পারেন তবে তিনি সেই সৃষ্টি বুঝতে এবং তার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারেন কি? প্রকৃত সমালোচনা করতে হ'লে কবি ভাবের মধ্যে যা' পেয়েচেন সমালোচককেও তাই পেতে হয়—হয় ত অনেক সময় সমালোচক ভাবের দিক দিয়ে কবিকে ছাড়িয়েও যান—তবেই তিনি কাব্যের সম্যক্ আলোচনা করতে পারেন। সমালোচক অনেক কাব্যের ভেতর থেকে এমন সব সত্যের আবিষ্কার করেচেন যা' লেখার সময় হয় ত কবির মনে ছিল না।

বন্ধুর বিচারের দিকটাও বেশ জোরালো—ফেলে দেবার জো নেই। এখন আপনাকে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে বলি। ইতি।

দিল্লী
২৮ শ্রাবণ ১৩৩৩

বিনীত
শ্রীঅবনীনাথ রায়

এই আশ্বিনের সংখ্যায় ধারাবাহিক উপন্যাস ও অন্য রচনাগুলি বাদ দিতে হইয়াছে।

কার্ত্তিকের সংখ্যাও আশ্বিনের ১৫ই তারিখের মধ্যে যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে। এই সংখ্যায় স্মৃতির আলো, জাঁ ক্রিস্তফ্, শরৎচন্দ্র, রূপছায়া প্রভৃতির অধ্যায়গুলি, যাহা পাইব তাহাই দিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।

বহুকালাবধি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলে লিখিতেন। প্রায় প্রতিমাসেই তাঁহাদের রচনায় কল্লোলের শোভা ও সম্পদ বাড়িত। এ বৎসর হইতে "কালিকলম" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিই এই কাগজখানির সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি, দু' একখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় কল্লোল ও কালিকলমের সম্বন্ধ লইয়া নানাপ্রকারের কাল্পনিক ও অন্যায় মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে।

কল্লোল হয় ত কিছু আগে ও কালিকলম তাহার পরে বাহির হইয়াছে। এই দুই পত্রিকার ভিতরে আদর্শের সমতা থাকাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। সেই কারণে কালিকলম পত্রিকাখানিকে কল্লোলের নামের সহিত জড়াইয়া নানা প্রকারে তাহার বিরূপ এবং অসংবদ্ধ সমালোচনা করা কোনও সাহিত্যানুধ্যায়ীরই উচিত নহে।

ইহাদের লেখা পড়িয়া মনে হয়, এই দুইখানি পত্রিকা ভিন্ন বাঙলাদেশে যেন আর কোনও পত্রিকা নাই। সমালোচনা যতই সত্য ও কঠিন হউক তাহা সহ্য করা বা গ্রহণ করা অতি সহজ কিন্তু তাহা খেলো ও অসম-আলোচনা হইলে তাহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।

উক্ত দুই একখানি পত্রিকার আলোচনা পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারা কালিকলম পত্রিকার প্রতি যেন বিশেষ কারণে বিরূপ। যদি ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কিছু আক্রোশ থাকে তাহা প্রকাশ্যে এ ভাবে প্রকাশ করা নিন্দনীয়। বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচার মানস করিয়াই ইহারাও কালিকলম পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যকে অবহেলা করিয়া তাঁহাদের অযথা নিন্দা করিয়া যাঁহারা বর্ত্তমান সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ, তাঁহারা যেন এরূপ আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হন্। বর্ত্তমান সাহিত্যের সেবকদের পক্ষ হইতে আমাদের এই নিবেদন। কোনও পত্রিকার রচনা লইয়া কেহ সঠিক ও সংজ্ঞাবদ্ধ সমালোচনা করেন তাহাতে কাহারও দুঃখিত হইবার কথা নহে। কিন্তু বারম্বার একই পত্রিকাকে ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি নিন্দাবাদ করাকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে অনুদারতা বলিয়াই মনে করি।

প্রত্যেক পত্রিকারই একটা সার্থকতা থাকে, তাহা ছোটই হউক আর বড়ই হউক। কিন্তু সেই সার্থকতাকে অস্বীকার করিতে যাইয়া যাঁহারা নিজ পত্রিকার সার্থকতাটুকুকে পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন অনুদার আলোচনা ত্যাগ করিয়া সহানুভূতিপূর্ণ ও উদার সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যের শ্রী-সম্পদের সহায় হন্।

সুকুমার ভাদুড়ীর ঋণ-শোধ-ভাণ্ডারে গতমাসের নিম্নলিখিত দান কয়টি কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় (দিনাজপুর)	২৲
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী)	১৲
শ্রীযুক্তা অদিতি দেবী (কলিকাতা)	১০৲
বেঙ্গলী ক্লাবের সদস্যবর্গ (দিল্লী)	১০৲
	২৩৲

কল্লোল

কার্ত্তিক, ১৩৩৩
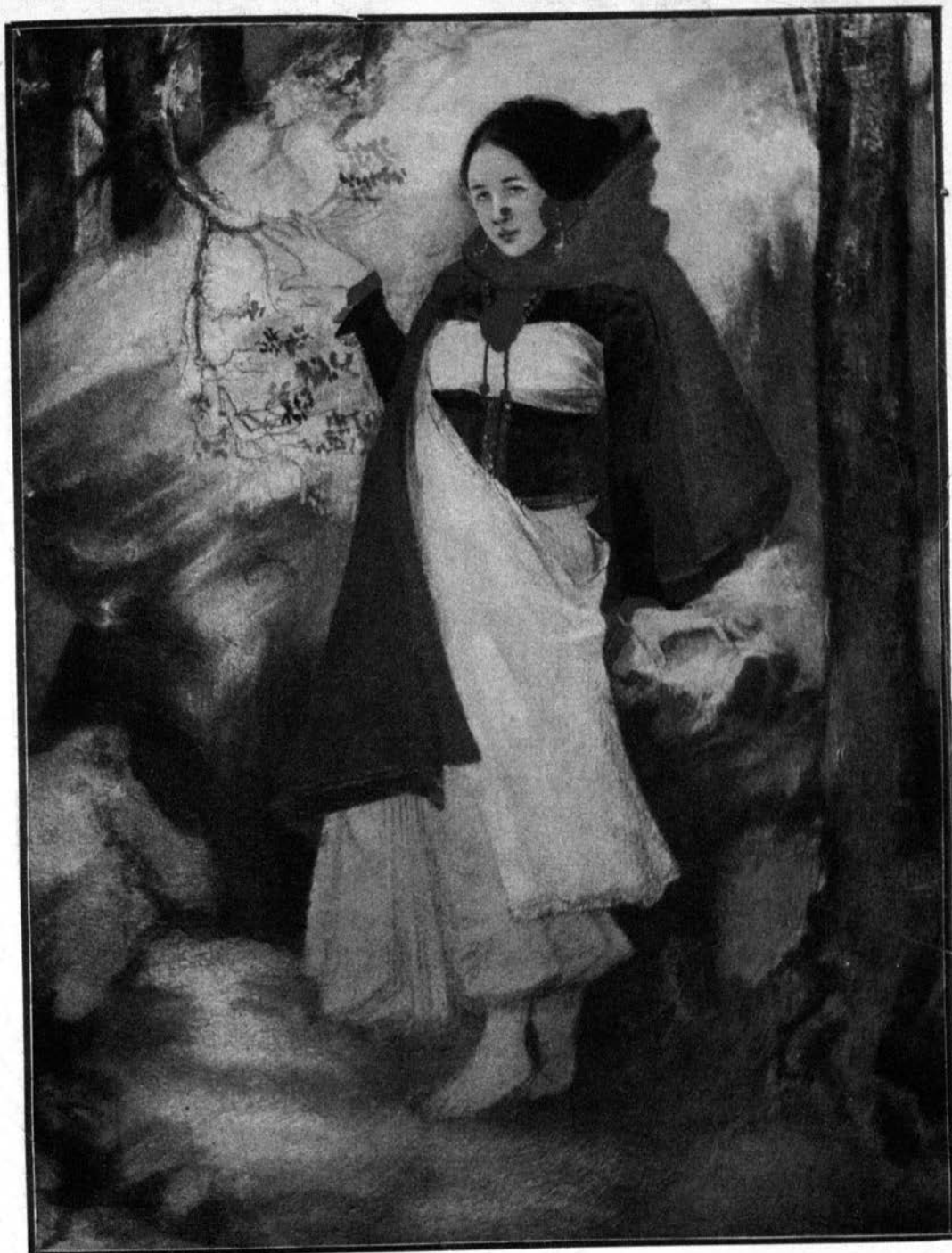
শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শাপভ্রষ্ট

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে' আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্দ্ধে মম রক্তিম আকাশ,
প্রভাত সূর্য্যের লজ্জা রঞ্জিত করেছে অরণ্যানী,
সদ্যনিদ্রাজাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল 'পরে
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ—
কামনার বহ্নি সে যে স্বপনের সলজ্জ বিকাশ—
গোলাপের বর্ণে বর্ণে স্বপ্ন-সুধামাখা,
রক্তবর্ণ কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে,
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,

রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা বন্যায়।
নিস্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গ-মথিত ফেণা রেখে যায় ধরণীর দেহে ;
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন জলধিগর্ভে।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্ম্মর
প্রেমগুঞ্জনের মত কি অমৃত ঢালে হিয়া-মাঝে !
রবির গভীর স্নেহে শিশিরের সজল মায়ায়
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ পবন তারে মৃদুহাস্যে আন্দোলিয়া যায়,
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ-তলে।
স্তব্ধচিত্তে চেয়ে থাকি ; অন্তরের নিরুদ্ধ-বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য কৃপণের সঞ্চয়ের মত
আনন্দের বিচিত্র শোভায়।
সুধায় নির্ম্মিত মোর দেহ-সৌধখানি
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি তারে আকাশের অকূল-আলোকে
অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ !

অক্ষম, দুর্ব্বল আমি, নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—

জীবনের দীর্ঘপথে যাত্রা করেছিনু কোন্ স্বর্ণরেখা-দীপ্ত
উষাকালে,
আজ তার নাহি ক' আভাষ!
আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে বসে' আছি নীরব
ব্যথায় শান্তমুখে
ঝরে'-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
সেই মোর চিরন্তন গোধূলি-আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়গুঞ্জন,
অকল্যাণ বায়ুবহ্নি প্রাণের মন্দিরে
নির্ব্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ;
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।
আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গন।
সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রা-বাঁশি বেজে ওঠে;
দৈন্য ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার,
যৌবন আমার অভিশাপ!

ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধশান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে,
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার—
'হে তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'

শাপভ্রষ্ট দেব আমি !
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগবিহঙ্গের মত
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
যার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলে যায় হর্ষের বিজলী ;—
নেত্রের মুকুরে তারে দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি—
দেখিয়াছি দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আপনার ছায়া—
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মত অপরূপ
ভাস্করের মত জ্যোতির্ম্ময়—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।
তখন বিষণ্ণ বায়ু নিঃশ্বসি' কহিয়া গেছে কানে
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কহেছে সব কথা,
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মত—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !

তাই আজ ভাবি মনে মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।

শেফালি সৌরভ আমি রাত্রির নিঃশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান্ মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ!—
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত!
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি!

আলেয়া
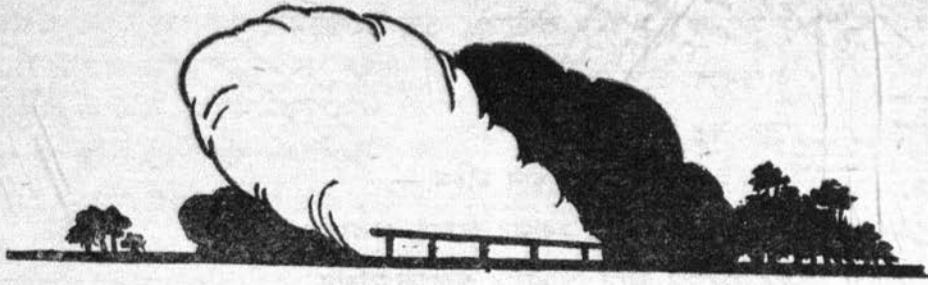
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

পড়ো জমিটার ধারে একতলা বাড়ীখানা—তারের জাল দিয়ে ঘেরা; কাক-কোকিল ঢুকিবার উপায় নাই। রাস্তার সমতা থেকে নীচু, সুতরাং বৃষ্টি হইলে ভিতরে জল জমে। লোকগুলা মাছের মত ভাসিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে, বাড়ী নয় ত খাঁচা। আরও'কত কি বলে।

দিন-রাত ভিতরে হরিনাম হয়। চীৎকারে কান ঝালাপালা করে। কানাঘুষা হয়, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

পাশের বাড়ীতে যে মেয়েটার সেদিন বিবাহ হইয়াছে সে ইহার চেয়েও আরও কি একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

বৈষ্ণবী সে কথার উত্তর দেয় নাই—কিই বা দিবে! কেবল বলিয়াছিল, রাগ কর কেন ভাই, বামুনেরা ত নাস্তিক নয়।

মেয়েটা ছাদের পাঁচিলে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া বলে, তোমার সাধ আহ্লাদ কিছু নেই গা? কেবল ওই 'ভজ নিতাই গৌর'? বলিয়া বৈষ্ণবীর বেশ-বিন্যাস দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে।

বৈষ্ণবী বলে, সাধ আহ্লাদ আর কি ভাই। উনি বলেন, নামের মধ্যে ওসব ডুবে যায়—বলিয়াই একটু হাসে। সাহস করিয়া আবার বলে, তুমিও জপ কর না ভাই, দিন-রাত কর—দেখবে মনটি কেমন ফুর ফুর করবে—

মেয়েটা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে, বলে দূর—লোকে বলবে কি? বলিয়া চলিয়া যায়।

আবার আসে। বলে, তোমার নাম ত বোষ্টুমী, আর নাম নেই বুঝি?

বৈষ্ণবী একটু ভাবে, তারপর হাসিয়া বলে, আছে, তবে সে নামে কেউ ডাকে না—বলিয়া সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলে, শুনে হাসবে না? আমার নাম লীলা।

মেয়েটার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়। চোখে চোখে চাহিয়া বলে, ওই দাড়ীওলা বুড়োটা কে?

বৈষ্ণবী একটু চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, উনিই ত—বলিয়া চঞ্চল পদে চলিয়া যায়, আর আসে না।

লোকের ভিড় লাগিয়াই আছে। সদাসর্ব্বদাই কীর্ত্তন চলে। সরু দালানটার উপর তাহারা ধুম্ ধুম্ করিয়া নাচে।

বৈষ্ণবীও নাকি ঘরের ভিতর নাচে, কিন্তু কেউ দেখিতে পায় না।

দলের মধ্যে মতিরামের সাধনা অদ্ভুত। নাচ গান করিতে করিতে সে প্রায়ই আছাড় খাইয়া পড়ে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে—চোখ দিয়া ধারা গড়ায়। সকলে বলে, ওর ওপর 'ভর' হয়েছে—ঠাকুরের দয়া—আহা!

রাধানাথ এ কথা শুনিয়া আড়ালে গিয়া হাসে। লীলা জানলার ফাঁক দিয়া তাহার হাসি দেখিতে পায়।

রাধানাথের সহিত কথা কহিতে তার একটুও লজ্জা করে না। জানলাটা আর একটু ফাঁক করিয়া বলে, হাসচেন যে?

রাধানাথ মুখ ফিরাইয়া বলে, হাসি আসে তাই—এতদিন হরিনাম কচ্ছি কিন্তু আমাদের ওপর ঠাকুরের দয়া নেই— বলিয়া আবার হাসে।

চোখ পাকাইয়া লীলা বলে, দয়া হবে কোত্থেকে? অবিশ্বাসী মন নিয়ে কি নাম করা যায়? কথায় বলে, 'মনে মুখে এক হও।'

রাধানাথ মুখ ফিরায়। আবার বলে, তোমার বিশ্বাস আছে ত?

খু-ব আছে, তোমাদের চেয়ে— বলিয়া লীলা আড়ালে সরিয়া যায়।

আবার খানিক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসে। মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া বলে, নাচুনি আরম্ভ হয়েছে—এখানে দাঁড়িয়ে যে?

রাধানাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, এমনি—বুড়ো বয়েসে আর নাচতে ভাল লাগে না।

লীলা হাসিয়া ফেলে কিন্তু নিজের হাসিতে লজ্জিত হইয়া ঘাড় ফিরায়। তারপর বলে, বিষ্টুবাবু আবার হাউ হাউ ক'রে কাঁদে—

ঠোঁট উল্টাইয়া রাধানাথ বলে, নামের মাহাত্ম্য! আমার কই চোখে জল আসে না—তোমার?

রামো—ওসব আদিখ্যেতা— বলিয়া লীলা চলিয়া যায়।

রাধানাথ উঁকি মারিয়া লীলার পথের দিকে চায়। কিন্তু লীলা আসে না।

সন্ধ্যার পর সকলে চলিয়া যায়। রাধানাথ যায় না। তাহার উপর বাবাজির কৃপাটা একটু বেশী।

ধুহচিতে ধুনা দিয়াই তিনি বলেন, কোথায় গেলে গো? রাধুর বসবার আসনটা এগিয়ে দাও না—

থাক্ থাক, আর আনতে হবে না— রাধানাথ বলে।

কিন্তু লীলা আসন আনে। বাঁ হাতের আঙুল কয়টা দিয়া মুখের হাসি টিপিয়া ধরিয়া বলে, এই যে পেতে দিচ্ছি—

রাধানাথও আড়চোখে চাহিয়া হাসে। বিনা কারণেই হাসি।

লীলা আসন পাতিয়া দেয়। তারপর রাধানাথের সুমুখ দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যায়—যেন ছুঁইয়া না ফেলে।

বাবাজি পিছন ফিরিয়া তখন মন্ত্র জপেন।

দরজার আড়ালে গিয়া লীলা বসিয়া পড়ে। রাধানাথ দেখিতে পায়। বাবাজি মুখ ফিরাইয়া বলেন, দোষ নেই বাবাজি—গুরুপত্নীর সঙ্গে কথা চল্‌তে পারে, আমাদের শাস্তরে বাধে না—

লীলা মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসে। রাধানাথ বিনয় করিয়া বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু তাই বলে কিসকলেই কথা বল্‌তে পারে?—

তা নয়। তবে আমি তোমাকে চিনি কি না—সেই ছোট্ট বেলাটি থেকে—বলিয়া গুরুদেব চুপ করেন। একটু পরে আবার বলেন, কিন্তু মা বলতে হবে না বাবা—ওটা যেন জোর ক'রে সাধুগিরি দেখানো। আর উনি তোমার বয়েসেও বোধ হয় ছোট—দুটি ভাই বোনের সামিল। তুমি দিদি বলেই ডেকো—

রাধানাথ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে। মুখ তোলে না পাছে লীলার সঙ্গে চোখচোখি হয়। কানাচের ধারে একটা বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে। পাশের আস্তাবলে ঘোড়ার ক্ষুরের ঠক্‌ঠক্ শব্দ হয়। স্যাকরাদের ঘড়িতে টিং টিং করিয়া নয়টা বাজে।

রাধানাথ বলে, আমি উঠি এইবার—

উঠবে? আচ্ছা এসো— বাবাজি বলেন।

রাধানাথ আর কোনও দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া যায়। দরজার কাছে গিয়া বলে, কাল সকাল সকাল আসব গুরুদেব—

লীলা আপন মনে হাসে।

কদম ফুলের মত মাথাটি ছাঁটা—কাঁচায় পাকায় চুল। গায়ের রং কালো—দেহটিও নাদুস নুদুস। দাড়িটা ঠিক সজারুর পিঠের মত—সাত জন্মে ক্ষুর পড়ে না। চোখ দুটি দেখিয়া ত লীলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল, নামাবলীখানা গায়ে না থাকলে লোকে ডাকাত বলত—

খুঁ খুঁ করিয়া বাবাজি সেদিন হাসিতে হাসিতে লীলার চিবুক ধরিয়া বলিয়াছিলেন, রাধুর চেয়েও দেখতে ভাল ছিলুম—বুঝলে? লীলা আর কিছু বলে নাই। কিন্তু বিশ্বাসও করে নাই।

পাশের বাড়ীর মেয়েটা প্রায় রোজই বিকাল বেলা ছাদে আসিয়া দাঁড়ায়। আজও দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, শুন্‌চ অ-দিদি।

সরিয়া আসিয়া লীলা বলিল, কি ভাই?

ডুমুর ফুল নাকি?—দেখতে পাই নে কেন?

অনেক কাজ কি না—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, জানি গো জানি কত কাজ—তুমিটি আর আমিটি,' এই ত—সেই রাধু বাবুও থাকে বুঝি?

দূর্‌, সে থাকতে যাবে কেন? তারপর—এত সাজ-গোছ যে? লীলা বলিল।

মেয়েটা একটু হাসিয়া বলিল, তুমিই বা কি কম যাও ঠাকরুণ— চুল আঁচড়েছ, সাবানও মেখেছ, অমন কালাপেড়ে সাড়ীখানি, পায়ে আল্‌তা, ওকি, গলার কণ্ঠি কি হল?

অপ্রস্তুত হইয়া লীলা বলিল, ছিঁড়ে ফেলেছি ভাই—ভাল লাগে না—

বিচ্ছিরি দেখায়, না? বলিয়া মেয়েটি খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিল। তারপর বলিল, শ্বশুড়-বাড়ী যাচ্ছি—

মুখ তুলিয়া লীলা বলিল, সত্যি, আবার কবে আসবে?

মেয়েটা কি একটা তামাসার কথা বলিল। বলিয়া চলিয়া গেল।

চোখের উপর আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে। ঘরে আলো জ্বালা হয় না। না হ'ক—সংসারে অত দরদ কিসের? নিত্য এ সন্ধ্যা-জ্বালা, নিত্য ঠাকুরের সেবা—আরতি—সবই প্রাণহীন! কেন এ সব!

বাবাজি ডাকেন, শুন্‌চ—ওগো—

লীলা কাছে গিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়ায়। বাবাজি ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে বলেন, কাল সকাল-সন্ধ্যে হরিনাম হবে—জান ত?

—না, বলিয়া একটু থামিয়া লীলা পুনরায় বলিল, এখন কিছু দিন বন্ধ থাক—আমি বলি—

বাবাজি ভুরু উঁচু করিয়া বলিলেন, কেন?

তবে হ'ক— বলিয়া লীলা বাহির হইয়া গেল।

রাধানাথ আসিয়া হাজির। বাবাজি বলিলেন, শুনচ রাধু—তোমার দিদিটি কি বলে?

চৌকাঠের উপর বসিয়া রাধানাথ বলিল, কি?

বলে হরিনাম বন্ধ থাক—চুপ ক'রে রইলে যে?—শিউরে ওঠবার কথা এ—

বাবাজির গোল গোল চোখ দুইটা বড় হইয়া ওঠে।

রাধানাথ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না। 'পদাবলী'খানা লইয়া নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, না হয় বন্ধ করেই দিন্‌—

বাবাজি বলিলেন, দিদির মন্তর কানে গেল বুঝি? তোমার দিদিটি বেশ—বলিয়া হি হি করিয়া হাসেন। পুরু ঠোঁটের ভিতর হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়ে।

রাধানাথ কিন্তু হাসে না বরং তার মুখ কালো হইয়া ওঠে। দরজার আড়ালে সাড়ীর আঁচলটুকুর দিকে মুখ তুলিতে ভয় করে।

বাবাজি আবার বলিলেন, বন্ধ হবে কিন্তু বুঝলে রাধু—হরিনামে কি পেট ভরে? কাল বেজায় পাওনার হল্লোড়

যে—ভুফোঁটা চোখের জলেই কেল্লা ফতে—ব'স, আসছি—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সুমুখের দরজাটি একটু ফাঁক হয়। লীলা উঁকি মারিয়া বলে, চলে গেছেন!

হুঁ! রাধানাথ বলে। বলিয়া এ-দিক ও-দিক চায়।

আমি আপনার কানে মন্তর দিয়েছি, না?

কে বললে?

লীলা বলিল, না তাই বলছি— বাড়ী যাবেন না? রাত হয় নি বুঝি?

হলেই বা জলে পড়ে নেই ত— রাধানাথ বলিল। মুখের হাসি লুকানো যায় না।

লীলা এ-দিক ও-দিক চায়। তারপর বলে, উনি নাকি আগে সুন্দর ছিলেন?

বিশ্বাস হয় না বুঝি?

বিশ্বাস কল্লেই হয়— লীলা বলে। বলিয়াই বাহিরের দিকে চায়। কিন্তু কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতের হাওয়ায় গা শির্ শির্ করিয়া ওঠে। রাধানাথ গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন—

এরই মধ্যে? রাত ত হয় নি— লীলা বলিল।

কিন্তু রাধানাথ পা বাড়াইয়া বলে, যাই আস্তে আস্তে—

কাল কখন আসা হবে? বলিয়া লীলা আলো হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়।

দুয়ারের কাছে গিয়া রাধানাথ হাসিয়া ফেলে, বলে, আমার সব খবরই কি তোমায় দিতে হবে?

লীলা আবার পিছন ফিরিয়া চায়। তারপর বলে, দিলেই বা—পর ত নই— বলিয়া মুখ নীচু করে। নিঃশ্বাসটা চাপিয়া রাখে।

রাধানাথ কি বলিতে যায়— পারে না। শুধু বলে, আচ্ছা— বলিয়া চলিয়া যায়!

সকালে সোরগোল শুরু হয়। নানা ঢঙের কীর্ত্তনীয়া আসিয়া নানা কসরৎ দেখায়।

রাধানাথের মন যায় না। আড়ে আড়ে ঘরের ভিতর চায়। আবার খঞ্জনী বাজায়।

লীলা জানলার আড়ালে দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া ডাকে। রাধানাথ থুথু ফেলিবার নাম করিয়া উঠিয়া কাছে আসে।

লীলা বলে, রোজ রোজ তোমার ভাল লাগে?—আমার লাগে না।

বাবাজি রাগ করেন যে না এলে— রাধানাথ বলে।

লীলা বলে, তা বললে কি হয়? মানুষের মন ত—চেঁচানির চোটে বাড়ী ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে—ওই যে-ওই আরম্ভ হল—বাবারে—

রাধানাথ চলিয়া যাইতে চায়। কিন্তু লীলা বাধা দিয়া বলে, থাক্—একটু পরেই হবে, না হয় বাড়ী চলে যাও—এখানে থেকে কাজ নেই। নয় ত এই ঘরে এসে ব'স—

না—না—উনি হয় ত দেখতে পাবেন। এবং আরও কি গোঁজ গোঁজ করিয়া বলে। মুখখানা লাল হইয়া ওঠে।

রাধানাথ বলে, দেখতে পেলেই বা—তাতে কি? লজ্জা করে বুঝি?

লীলা সে কথার উত্তর দেয় না। একটু পরে বলে, নাকের ওই তেলক মুছে ফেল'—টিকিই বা রাখবার দরকার কি? বুড়োর বেহদ্দ!

রাধানাথ আর হাসি চাপিতে পারে না, বলে, মানায় না বুঝি?

জোরে ঘাড় নাড়িয়া লীলা বলে, না—বিচ্ছিরি দেখায়।

আবার হাসি আসে। রাধানাথ বলে, কি কল্লে তোমার পছন্দ হয়?

দূর্, আমার আবার পছন্দ— বলিয়াই লীলা কপাটের পাশে লুকায়।

লোহার গরাদে মুখ লাগাইয়া রাধানাথ বলে, বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে বুঝি, আমাকেও লজ্জা?

লীলা আর একটু সরিয়া যায়। বলে, যাও আমি জানি নি। এবং আরও একটা কথা বলে, তোমার বউকে জিজ্ঞেস করগে—

বাবাজির পরণে বেনারসী জোড়। হাতে সোনার বালা। চন্দনচর্চ্চিত ললাট। সময় সময় চোখে কাজলও লাগান। মাথায় জরির তাজ ত আছেই।

তাঁর গানের সঙ্গে দোয়ারেরাও চীৎকার করে। গলার শিরগুলা ফুলিয়া ওঠে।

আড়াল হইতে দেখিয়া লীলার সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে।

রাধানাথও হাসি চাপিতে পারে না। সময় সময় বাবাজির নজরে পড়িয়া যায়। হাতের দিকে চাহিয়া বলেন, তাল কেটে যাচ্ছে হে রাধু—

আড়ালে দাঁড়াইয়া ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া লীলা বলে, যাবে না? সব তাল বেতালের দল যে— বলিয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া যায়। রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, হরি-কথায় সকলের নাল গড়িয়ে পড়ে। অত করে হাত নেড়ে ডাকলুম, আসা হ'ল না—

বেলা গড়াইয়া আসে। সোরগোল থামিয়া যায়। সকলে ঘরে ফেরে। বাবাজি ভিতরে আসিলে লীলা বলে, না খাইয়ে অমনি ছেড়ে দিলে?

কাকে?

ওই ইয়েকে— লীলা বলে।

বাবাজি বুঝিতে পারেন। বলেন, কে—রাধু? ও ত চলেই গেল— বলিয়া রেজ্‌কিগুলা গুণিয়া গুণিয়া টাকায় পরিণত করেন। লীলা চোখ পাকাইয়া চাহিয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় বলে, কেন খেয়ে গেলেই হ'ত—এত করে রাঁধলুম—

বাবাজি হাসিয়া বলেন, পরের ওপর এত দরদ—বেশ —দিদি বটে—

দরদ না ছাই—যা নয় তাই বলা— আপন মনে লীলা বলে।

বাবাজি বিষয়কর্ম্মে বাহির হইয়াছিলেন। দু একজন তামাক খাইতে আসিয়াছিল কিন্তু কলকে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

রাধানাথ তামাকও খায় না। তবু আসা চাই। ঠাকুর-ঘরে তাহার অবাধ প্রবেশ।

লীলা চৌকাঠে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি বেরিয়ে গেছেন—

তা ত জানি—তুমি তাড়িয়ে দেবে নাকি?

আমার দায় পড়েছে। একলাই থাকবে? আমি রাঁধতে যাচ্ছি।

যাও, দোকলা আর পাব কোথায়?

লীলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

আবার ঘুরিয়া আসিল। কথা বলা চাই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার বিয়ে হচ্ছে নাকি?

কে বললে?

শুনলুম—তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।

রাধানাথও হটিবার পাত্র নয়। বলিল, যাদের এত আপনার লোক তার বিয়ের দরকার কি?

লীলা বলিল, আমি আবার আপনার লোক কিসের? এমন ত কত আছে।

এমন একজনও নেই—সত্যি বলছি।

আমার ভাগ্যি।

রাধানাথও হাসিয়া বলিল, আমারও ভাগ্যি, নৈলে এমন মিষ্টি কথায় ত আর পেট ভরে না।

বাবাজি আসিয়া পড়িলেন। রাধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, দিদির সঙ্গে আলাপ হচ্ছে বুঝি? বেশ বেশ—

লজ্জায় রাগে লীলা চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজি পা ধুইয়া ঘরে আসিয়া বলিলেন, দিদির মতন একটি সোন্দর মেয়ে পেলে বিয়ে কর—না রাধু?

রাধানাথ বলিল, কি যে বলেন আপনি—

ঠিক কথাই বলি হে। আমারও একদিন অমন ছিল। আজই না হয় অর্থ পেয়ে অনর্থ ঘটেছে। কামিনী বড় আরামের চীজ বাবাজি—বুড়ো বয়েসেও ধাক্কা দেয়— বলিয়া হি হি করিয়া হাসিলেন।

সিঁড়ির কাছে আসিতেই রাধুর গায়ে একটা টিপ্ দিয়া লীলা বলিল, আমার মতন মেয়ে পেলে বিয়ে কর না কি?

রাধানাথ থমকিয়া দাঁড়ায়। তারপর লীলার অতি

নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলে, তোমার মতন—তুমি ত আর নও ?

যাও— বলিয়া লীলা হাসিয়া চলিয়া যায়।

ক'দিন আর কীর্ত্তন বসে না। রাধানাথেরও দেখা নাই। কেন আসে না তা লীলা ভাবিয়াই পায় না। সে বলে তপিলের জোর আছে বুঝি ?

বাবাজি হাসিয়া বলেন, আছেই ত—পয়সার রস না থাকলে শুধু হরি ভাল লাগে ?

লীলা বলে, লোকজন এলে গেলে মনটা ভাল থাকে—

বাবাজি আড়চোখে চাহিয়া বলেন, রাধুর জন্যে বুঝি মন খারাপ। তা ত হবেই, ভায়েরও বাড়া—

রাধু—রাধু—কেবল রাধুর নাম! খাইতে শুইতে কেবল রাধানাথ বাবু। কান ঝালাপালা হইয়া যায়।

বাবাজি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন, দরদ বড় বালাই—

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলে, ষাট ষাট, আমি কি তাকে বালাই বলছি ?

বাবাজি পুরু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলেন, বাবা—এত দরদ! মায়ের পেটের দিদিও এমন হয় না।

লীলা বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ দিদি—দিদি—কেবলই দিদি! তিনি আমার বয়েসে বড় তা জান ?

বাবাজি থতমত খাইয়া বলেন, না তাই বলছি—বুঝলে ?—ও একই কথা। তবে সে কি বলবে তাই ভাবচি—

বাবাজির রকম দেখিয়া লীলা হাসিয়া ফেলে। বলে, দিদি বলবার কি দরকার ? আপনি বল্লেই ত হয়—

রাধু কিন্তু 'আপনিও' বলে না—দিদিও বলে না। বাবাজির সঙ্গে দেখা করিতেও আজকাল সময় হয় না। রাস্তা দিয়া যায়—একবার ফিরিয়া তাকায়।

...হয় ত কোনও দিন লীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে তার সঙ্গে চোখচোখি হইয়া যায়। লীলা বলে, বাবুর দেখা নেই কেন ?

বাবু বলে, অনেক কাজ কি না, তাই।—ভাল ত ?

আমার আবার ভাল মন্দ। মাটির সঙ্গে মিশলেই হয়।

রাধানাথ একটু হাসিয়া চলিয়া যায়। লীলা চাহিয়া থাকে।

চটি জুতা জোড়াটি দেয়ালে ঠেকো দিয়া রাখিয়া বাবাজি বলিলেন, রাধুর সঙ্গে দেখা হল, বুঝলে ?

লীলা মুখ ফিরিয়া চাহিল। বলিল, আসছে নাকি ? ক'দিন আসে নি কেন ?

বলে অনেক কাজ, সময় হয় না। একটি খবর দিতে পারি, বল সন্দেশ খাওয়াবে ? তোমারই ভাই ত—

কি ?

তার যে বিয়ে। এই ক'টা দিন বাদে। তাই দেশে যাবার যোগাড় কচ্ছে।

দেয়ালের ধারে বসিয়া পড়িয়া ঢোঁক গিলিয়া লীলা বলিল, বিয়ে, কার সঙ্গে ?

তা কি জানি—তবে মেয়েটি নাকি সুন্দরী— বলিয়া বাবাজি ঘরে ঢুকিলেন।

শূন্য দৃষ্টিটা যেন গতিহীন—অর্থহীন! সর্ব্বস্ব হারাইলে লোকের চোখ দিয়া জল পড়ে কি ?

শীতকালের বেলা ছোট। কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। উপায় কি!

বাবাজির আজ ভাঙ সেবা হইয়াছে। সুতরাং সন্ধ্যা হইতেই তিনি কুম্ভকর্ণ। কার জন্যই বা রান্নাবাড়া, খাবেই বা কে। নিজের পরিচর্য্যা ভাল লাগে না। জীবন, না দাসত্ব—যুগ যুগ ধরিয়া কেবল বন্ধনের অত্যাচার। সদর দরজায় দাঁড়াইয়া লীলা ভাবিতেছিল।

শীতরাতের চাঁদের আলো—অবশ—নিঝুম। পৃথিবীর বুকের উপর জীবনের স্পন্দন থামিয়া গেছে।

...পিছন হইতে রাধানাথ বলিল, এখানে ব'সে যে ?

লীলা চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় সাম্‌লাইয়া লইল। বলিল, এমনি—

গুরুদেব কই ?

ঘুমুচ্ছেন। জাগালে তাঁর শরীর খারাপ হবে। কেন ?

দেশে যাচ্ছি, তাই একবার—

আচ্ছা কাল সকালে আমি বলব — লীলা বলিল।

এ মুখভঙ্গীর সহিত রাধানাথের কোনও দিনই পরিচয় ছিল না। তাই সে নিজের বক্তব্যও শেষ করিতে পারিল না। কিন্তু কথা কিছু কওয়া চাই। তাই সে বলিল, উঃ কি শীতই পড়েছে— বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় মাপ কর তুমি—কিছু মনে কর না—

লীলা বলিল, দোষ কল্লেই লোকে মাপ চায়—আপনি মাপ চাচ্ছেন কেন ?

তাহার সজল কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধানাথ সরিয়া আসিয়া বলিল, কাঁদচ ?—কেঁদো না দিদি—ছোট ভাই ব'লে মাপ কর।

লীলা সাড়া দিতে পারিল না—ভিতরে চলিয়া আসিল। আবার বাহিরে গিয়া দেখিল রাধানাথ চলিয়া গেছে। অনেক দূরে তার অস্পষ্ট ছায়াটা মিলাইয়া যাইতেছিল।

...বিপুল জ্যোৎস্না মাটির বুকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সে মৃত্যুর মত বিষাদময়ী—অচেতন। তুহিনের যবনিকা সেই মৃত পৃথিবীকে ঢাকিয়া দেয়। তাহার দিকে চাহিলে বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরে। চক্ষু বুঁজিয়া আসে।